এসলাম দেহ ও আত্মার ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা

বর্তমানের বিকৃত সুফিবাদ

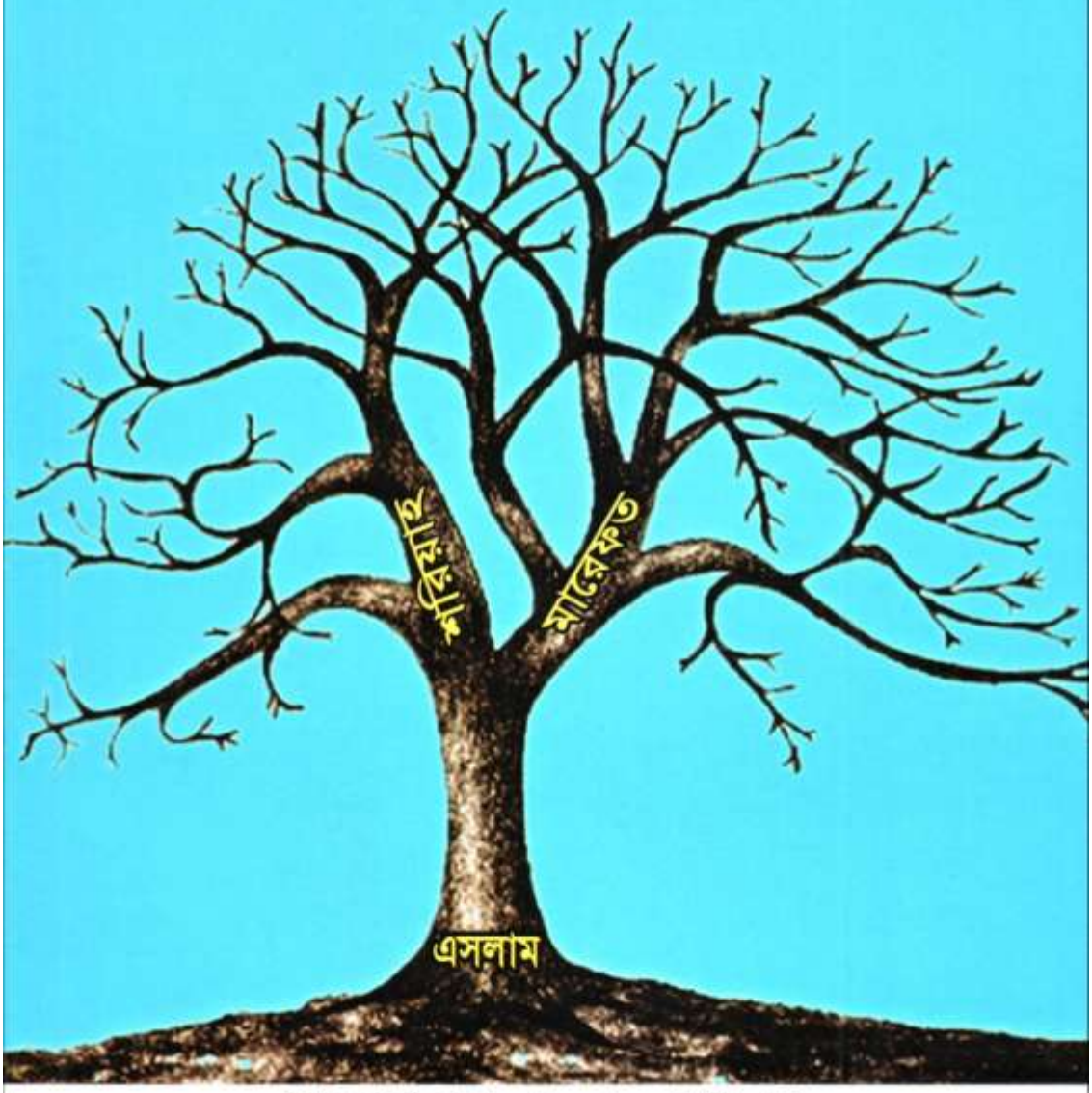

এমামুয্‌যামান, The Leader of The Time

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

এসলাম দেহ ও আত্মার ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা

বর্তমানের বিকৃত সুফিবাদ

এমামুয্যামান The Leader of The Time

জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

এসলাম দেহ ও আত্মার ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা

বর্তমানের বিকৃত সুফিবাদ

সম্পাদনা : মো: রিয়াদুল হাসান

(বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে)

প্রচ্ছদ: মো: মনিরুল এসলাম

প্রকাশনা ও পরিবেশনা

তওহীদ প্রকাশন

(বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের একমাত্র পরিবেশক)

৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন: ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০১৭৪৬৫১

www.taweedprocation.org

www.hezbuttawheed.com

ISBN: 978-984-8912-23-2

বাংলাদেশ ন্যাশনাল লাইব্রেরী কর্তৃক গৃহীত-১০.০৪.২০১২ ঈসায়ী

১ম প্রকাশ : ১৫ মার্চ ২০১২ ঈসায়ী (৫,০০০ কপি)

২য় সংস্করণ : ১৫ এপ্রিল ২০১২ ঈসায়ী (১০,০০০ কপি)

৩য় মুদ্রণ : ২০ মে ২০১২ ঈসায়ী (১০,০০০ কপি)

প্রকাশকাল: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ঈসায়ী

মূল্য : ৫০.০০ টাকা মাত্র

এমামুয্যামান The Leader of The Time

জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মাননীয় এমামুয্যামান টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারে ১৫ই শাবান ১৩৪৩ হিজরী, মোতাবেক ১৯২৫ সনে ১১ মার্চ শেষ রাতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব কাটে নিজ গ্রাম করটিয়া। কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজে শিক্ষা লাভের সময় তিনি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়েন। এবং এই সংগ্রামের কিংবদন্তীতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য্য লাভ করেন। যাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম, মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, অরবিন্দ বোস, শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দী অন্যতম। অল্প বয়স থেকে সময় পেলেই তিনি বেরিয়ে পড়তেন শিকারে, রায়ফেল হাতে হিংস্র পশুর খোঁজে ছুটে বেড়াতেন দেশের বিভিন্ন এলাকার বনে জঙ্গলে। ১৯৬৩ সনে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ছোট বেলায় তিনি যখন মোসলেম জাতির পূর্ব ইতিহাসগুলি পাঠ করেন তখনই তাঁর মনে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। তিনি মোসলেম জাতির অতীতের সাথে বর্তমান অবস্থার এই বিরাট পার্থক্য দেখে তিনি ভাবতে থাকেন যে কিসের পরশে এই জাতি চৌদ্দশ বছর পূর্বে শিক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে, ধনবলে পৃথিবীর

সবচেয়ে শক্তিমান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি অঙ্গনে অগ্রণী জাতিতে পরিণত হোয়েছিল, আর কিসের অভাবে আজকে তারা দুনিয়ার সবচেয়ে হতদরিদ্র ও অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত, সব জাতির দ্বারা লাঞ্ছিত এবং অপমানিত? মহান আল্লাহ ধীরে ধীরে তাঁকে এই প্রশ্নের জবাব দান কোরলেন। ষাটের দশকে এসে তাঁর কাছে বিষয়টি দিনের আলোর মত পরিষ্কার হোয়ে ধরা দিল। মানবজাতির সামনে এই মহাসত্য তুলে ধরার জন্য বই লিখেন এবং ১৯৯৫ সনে হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৬ জানুয়ারী ২০১২ ঈসায়ী এই মহামানব প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে পর্দাগ্রহণ করেন।

বিশেষ অর্জন (Achievements)

১. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন: তিনি তেহরিক এ খাকসারের পূর্ববাংলা কমান্ডার ছিলেন এবং বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য 'সালার এ খাস হিন্দ' পদবিযুক্ত বিশেষ কমান্ডার নির্বাচিত হন।

২. চিকিৎসা: বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, তৎকালীন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল এসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত।

৩. সাহিত্যকর্ম: বেশ কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইয়ের রচয়িতা যার একটি ২০০৮ এর সর্বাধিক বিক্রয়কৃত বই। তাঁর বাঘ-বন-বন্দুক বইটি পাকিস্তান লেখক সংঘের (পূর্বাঞ্চল শাখা) সম্পাদক শহীদ মুনির চৌধুরীর সুপারিশে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে দ্রুতপাঠ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও তিনি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসা, ধর্ম ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছেন।

৪. শিকার: বহু হিংস্র প্রাণী শিকার কোরেছেন যার মধ্যে চিতাবাঘ, বন্য শুকর, অজগর সাপ, কুমির প্রভৃতি রোয়েছে।

৫. রায়ফেল শুটিং: ১৯৫৪ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

৬. রাজনীতি: পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) নির্বাচিত হন (১৯৬৩-৬৫) । প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য থাকা অবস্থায় তিনি 'কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এ্যাসোসিয়েশন' এর সদস্যপদ লাভ করেন।

৭. সমাজসেবা: হায়দার আলী রেডক্রস ম্যাটার্নিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল ও সাদাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা।

৮. শিল্প সংস্কৃতি: নজরুল একাডেমির আজীবন সদস্য।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রাককথন

পূর্ব দিগন্তে সূর্যের উপস্থিতি যেমন অন্ধকারের বিলুপ্তি নিশ্চিত করে ঠিক তেমনি সত্য যখন স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয় মিথ্যার অপনোদন তখন অবশ্যম্ভবী হয়ে পড়ে। সত্য আজ সমাগত সুতরাং মিথ্যাকে বিতাড়িত হতেই হবে। সমস্ত পৃথিবী যখন মিথ্যার কলো মেঘে ঢাকা ঠিক তখনই আল্লাহ পাক তাঁর অশেষ করুণায় এক মহাসত্য দিয়ে আমাদের মাঝে যামানার এমামকে পাঠালেন যেন আমরা মিথ্যার কালো মেঘ সরিয়ে সত্যের প্রকাশ ঘটায়। আমরা গুটিকয় মানুষ এই মহাসত্যকে সকলের মাঝে তুলে ধরার জন্য গত ১৮ বৎসর চেষ্টা করে যাচ্ছি। ২০১৩ সালে এসে সত্য প্রকাশে আপোষহীন কয়েকটি পত্রিকা সিদ্ধান্ত নেয় যে তারাও আমাদের সাথে সত্যপ্রকাশে সহযোদ্ধা হবে। "মানবতার কল্যাণে সত্যের প্রকাশ" এই স্লোগানকে বুকে ধারণ করে শুরু হয় "দৈনিক দেশেরপত্র পত্রিকার পাতায় ধারাবাহিকভাবে নিবন্ধের মাধ্যমে যামানার এমামের আদর্শ উপস্থাপন। খুব দ্রুত ব্যাপক পাঠক প্রিয়তা পায় আমাদের নিবন্ধগুলি, এতে আরও বেশি উৎসাহিত হয় "দৈনিক দেশেরপত্র পরিবার। একই সাথে (জাতীয় পত্রিকা) "দৈনিক নিউজ" সহ আরও বেশ কিছু আঞ্চলিক পত্রিকা (যেমন- কুষ্টিয়ার কাগজ, আরশীনগর, সময়ের কাগজ, আজকের সূত্রপাত, বজ্রপাত, জন মতামত, লালন কন্ঠ, বরিশাল আজকাল, বরিশাল প্রতিদিন, খবর বাংলা, মহাস্থান, সান শাইন, উত্তরের খবর, প্রথম খবর, স্বর্ণ সকাল, নীলফামারী চিত্র, রংপুর চিত্র, চাঁদপুর দর্পন, নবদিগন্ত সহ আরও অনেক দৈনিক পত্রিকা) আমাদের নিবন্ধগুলি নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করতে থাকে। আমাদের নিবন্ধগুলি প্রকাশ করায় পত্রিকাগুলির জনপ্রিয়তা দিনদিন বাড়তে থাকে। এছাড়াও বেশ কিছু জাতীয় দৈনিক (যেমন- দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ডেস্টিনি ইত্যাদি) বিশেষ দিনে আমাদের নিবন্ধ প্রকাশ করে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত আমাদের নিবন্ধগুলির জনপ্রিয়তা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, পাঠকদের অনুরোধে একই নিবন্ধ পুনঃ পুনঃ প্রকাশ এমনকি পুরনো পত্রিকা সরবরাহ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পর্ব ভিত্তিক নিবন্ধগুলির একটি পর্ব কোনক্রমে হাতে না পেলেই পত্রিকা অফিসে ফোন দিয়ে পূরনো পত্রিকা সংগ্রহ করেছে অনেক পাঠক। পাঠক চাহিদার কথা বিবেচনা করে এক পর্যায়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেই গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধগুলি একত্র করে পাঠকের হাতে ক্রমান্বয়ে বই আকারে তুলে দিব। তারই ক্ষুদ্র প্রয়াস এই বইটির সম্পাদনা। যেহেতু পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধের সমন্বয়ে এই বই এর প্রকাশ, তাই পাঠকরা

হয়তোবা মাঝে মাঝে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি লক্ষ করে থাকবেন। আশা করি আমাদের এই পুনরাবৃত্তিতে পাঠকরা বিরক্ত না হোয়ে নিজ গুণে ক্ষমা কোরে দিবেন এবং সত্য ও সুন্দর গ্রহনের মানুষিকতা নিয়ে পোড়বেন। তবেই মনব জাতি উপকৃত হবে।

মানবজাতি আজ তার জীবনকালের সবচেয়ে বড় সঙ্কটে পতিত হোয়েছে। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু কোরে সামষ্টিক জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে মানুষ চুড়ান্ত অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও নিষ্পেষণের শিকার। মানুষ এতটাই আত্মাহীন ও আত্মকেন্দ্রীক হোয়ে পড়েছে যে, যে যাকে যেভাবে পারছে প্রতারণা কোরে, পদপিষ্ঠ কোরে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ কোরছে। আমাদের চারপাশে এমন একটি জিনিসও অবশিষ্ট নেই যাতে মিথ্যা মিশ্রিত নেই। বাতাস, পানি পর্যন্ত বিষাক্ত হোয়ে গেছে। ন্যুনতম মনুষ্যত্ব না থাকায় তারা খাদ্যে বিষ মেশাচ্ছে, ঔষধে পর্যন্ত ভেজাল দিচ্ছে। মানুষ এমন এক দানবে পরিণত হোয়েছে যে তিন বছরের শিশুও তাদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। সব মিলিয়ে পৃথিবীটা যেন এক নরকপুরিতে পরিণত হোয়েছে। দুনিয়ার বুকে কল্পিত সীমারেখা টেনে ছোট ছোট ভৌগোলিক রাষ্ট্রে অধিক জনসংখ্যা আটকে রেখে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হোচ্ছে, সেখানে মানুষ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চরম দুর্দশাগ্রস্থ হোয়ে অনাহারে কু-শিক্ষায় অশিক্ষায় ধুকে মরছে। অন্যদিকে অল্প জনসংখ্যার রাষ্ট্র পৃথিবীর বিরাট এলাকা দখল কোরে সেটার প্রাকৃতিক সম্পদ রাজার হালে ভোগ কোরছে। কিছু রাষ্ট্রে যে প্রচুর খাদ্য উৎপাদন হয় তার একটা বিরাট অংশ জাহাজে কোরে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিতে হয়, অথচ অন্যদিকে বহু রাষ্ট্রের হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য এমন প্রকট আকার ধারণ কোরেছে যে, কেউ থাকার জায়গা না পেয়ে রাস্তার ফুটপাথে, রেলস্টেশনে, ব্রীজের নিচে বসবাস কোরছে আবার কেউ নিজ দেশে আলিশান বাড়ি বানিয়েও সন্তুষ্ট না হোয়ে বিদেশেও বিলাসবহুল বাড়ি কিনছে। --- বর্তমানের এই অশান্ত পৃথিবীর বীভৎস চিত্র ফুটে উঠেছে এই বইয়ের নিবন্ধগুলিতে পাশাপাশি এই চলমান সংকট থেকে মানব জাতির বাঁচার উপায় কী তাও খুঁজে পাবেন বইটিতে। আল্লাহ পাক আমাদের সত্য প্রকাশে দৃড় রাখুন, হেদায়াতে রাখুন। ---আমীন.

- মো: রাকিবুল বান্না

২০.০৫.১৪৩৩ হেজরী

সূচিপত্র

1.	উম্মতে মোহাম্মদীর জীবনের লক্ষ্য কি?	০৭
2.	জাতির উদ্দেশ্যচ্যুতি	০৯
3.	সুফি সাধক আর পণ্ডিত তৈরি করা শেষ দীনের লক্ষ্য নয়	১৫
4.	মহাসাধক ওয়ায়েস করনী (রা:) যুদ্ধে শহীদ হন	১৭
5.	খিদির (আ:) এর অতিমানবীয় বৈশিষ্ট্য	২০
6.	তাসাওয়াফ কি?	২২
7.	এসলামের প্রকৃত তাসাওয়াফ কি?	২৩
8.	জেহাদে আকবর নিয়ে অপপ্রচার	২৯
9.	শাহজালাল (রা:) এর তরবারী	৩৮
10.	উম্মাহ সম্পর্কে রসুলাল্লাহর একটি ভবিষ্যদ্বাণী	৩৯
11.	এসলামের স্বর্ণযুগ	৪১
12.	উম্মাহরপচনক্রিয়া	৪৫
13.	আল্লাহর রসুল ছিলেন যোদ্ধানবী	৫০
14.	জাতি কার্যত: মোশরেক ও কাফের	৫৪

বেসমেল্লাহের রহমানের রহীম

উম্মতে মোহাম্মদীর জীবনের লক্ষ্য কি?

আদম (আ:) থেকে শুরু কোরে মোহাম্মদ (দ:) পর্যন্ত আল্লাহ যতো নবী রসুল (আ:) মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য পাঠিয়েছেন তাদের প্রত্যেককেই যে মূল-মন্ত্র দিয়ে পাঠিয়েছেন তা হোচ্ছে তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। স্থান, কাল ও পাত্রের বিভিন্নতার কারণে দীনের অর্থাৎ জীবন ব্যবস্থার আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, এবাদতের পদ্ধতি ইত্যাদি বিভিন্ন হোয়েছে কিন্তু ভিত্তি, মূলমন্ত্র একচুলও বদলায় নি। সেটা সব সময় একই থেকেছে- আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তওহীদ। প্রেরিত প্রত্যেক নবী-রসুলকে আল্লাহ এই দায়িত্ব দিয়েছেন তারা যেন তাদের নিজ নিজ জাতিকে এই তওহীদের অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে নিয়ে আসেন।

পূর্ববর্ত্তী নবীদের যে কারণে আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন তাঁর এই শেষ নবীকেও সেই একই উদ্দেশ্যে পাঠালেন- অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষের জীবনে শান্তি, এসলাম প্রতিষ্ঠা কোরতে। তাকে (দ:) নির্দেশ দিলেন- পৃথিবীতে যত রকম জীবন ব্যবস্থা দীন আছে সমস্তগুলিকে নিস্ক্রিয়, বাতিল কোরে এই শেষ জীবন ব্যবস্থা মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠা কোরতে (সুরা তওবা ৩৩, সুরা ফাতাহ ২৮, সুরা সফ ৯)। কারণ শান্তির একমাত্র পথই আল্লাহর দেয়া ঐ জীবন বিধান। আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ নবীকে শুধু নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি শেখাতে পাঠান নি, ওগুলো তাঁর সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে জাতির দরকার সেই জাতির চরিত্র গঠনের প্রক্রিয়া, উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য দীনুল কাইয়্যেমা, সেরাতুল মোস্তাকীমকে পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা। সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে একটি সংবিধান (Constitution) সেটি যতো সুন্দর, যতো নিখুঁতই হোক না কেন, সেটা একটি জনসমষ্টি বা জাতির ওপর প্রয়োগ ও কার্যকর না করা হোলে যেমন সেটা অর্থহীন, তেমনি তওহীদের ওপর ভিত্তি করা দীনুল এসলাম, দীনুল হকের সংবিধান কোর'আনকে মানব জীবনের সর্বস্তরে, সর্ব অঙ্গনে প্রয়োগ ও কার্য্যকর না কোরতে পারলে তা অর্থহীন। তাই আল্লাহ তাঁর রসুলকে ঐ উভয় দায়িত্ব দিয়েই পৃথিবীতে প্রেরণ কোরলেন।

এই বিশাল দায়িত্ব, সমস্ত পৃথিবীময় এই শেষ জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করা এক জীবনে অসম্ভব। বিশ্বনবী (দ:) তাঁর নবীজীবনের তেইশ বছরে সমস্ত আরব উপদ্বীপে এই শেষ জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা

কোরলেন- এসলামের শেষ সংস্করণ মানব জীবনের একটি অংশে প্রতিষ্ঠা হলো। কিন্তু তাঁর উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পূর্ণ না, তাঁর দায়িত্ব সমস্ত পৃথিবী, সম্পূর্ণ মানব জাতি। এর আগে কোন নবীর উপর সম্পূর্ণ মানব জাতির দায়িত্ব অর্পিত হয় নি। যতদিন সম্পূর্ণ মানব জাতির উপর এই শেষ জীবন বিধান জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা না হবে ততদিন মানুষ জাতি আজকের মতই অশান্তি, যুদ্ধবিগ্রহ, অবিচারের মধ্যে ডুবে থাকবে- শান্তি, এসলাম আসবে না এবং বিশ্বনবীর (দ:) উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্বও পূর্ণ হবে না।

আল্লাহর রসুল (দ:) আংশিকভাবে তার দায়িত্বপূর্ণ কোরে চোলে গেলেন এবং তাঁর বাকী কাজ পূর্ণ করার ভার দিয়ে গেলেন তাঁর সৃষ্ট জাতির উপর, তাঁর উম্মাহর উপর। প্রত্যেক নবী তাঁর উপর দেয়া দায়িত্ব পূর্ণ কোরেছেন তার অনুসারীদের, তাঁর উম্মাহর সাহায্যে। কোন নবীই একা একা তার কাজ, কর্তব্য সম্পাদন কোরতে পারেন নি। কারণ তাদের প্রত্যেকেরই কাজ জাতি নিয়ে, সমাজ, জনসমষ্টি নিয়ে, ব্যক্তিগত নয়। কেউই পাহাড়ের গুহায়, নির্জনে, বা হুজরায় বোসে তার কর্তব্য করেন নি, তা অসম্ভব ছিলো। শেষ নবীর (দ:) বেলাও তার ব্যতিক্রম হয় নি। নবুয়ত পাবার মুহূর্ত থেকে ওফাত পর্যন্ত পৃথিবীর ব্যস্ততম মানুষটির জীবন কেটেছে মানুষের মধ্যে, জনকোলাহলে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামে, সশস্ত্র সংগ্রামে- এ ইতিহাস অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। নবুয়তের সমস্ত জীবনটা বহির্মুখী- যে দীন তিনি আল্লাহর কাছে থেকে এনে আমাদের দিলেন সেটার চরিত্রও হলো বহির্মুখী (Extrovert) সংগ্রামী। আল্লাহর রসুল (দ:) তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যে তার উম্মাহর উপর ন্যস্ত কোরে গেলেন তা যে তাঁর উম্মাহ পূর্ণভাবে উপলব্ধি কোরতে পেরেছিলো তাঁর প্রমাণ হলো তার উম্মাহর পরবর্তী কার্যক্রমের ইতিহাস। কারণ বিশ্বনবীর (দ:) লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উম্মাহ তাদের বাড়ীঘর, স্ত্রী-পুত্র, ব্যবসায়-বাণিজ্য এক কথায় দুনিয়া ত্যাগ কোরে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতার অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ কোরতে দেশ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলো। মানুষের ইতিহাসে এমন ঘটনা নেই যে, একটি সম্পূর্ণ জাতি এক মহান আদর্শ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পার্থিব সব কিছু ত্যাগ কোরে দেশ থেকে বের হোয়ে পড়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তারা তদানিন্তন পৃথিবীর দুইটি মহাশক্তিকে সশস্ত্র সংগ্রামে, যুদ্ধে পরাজিত কোরে সমগ্র মধ্য এশিয়ায় আল্লাহর আইনের শাসন কার্যকরী কোরেছিলো। ঐ মহাশক্তিশালী সাম্রাজ্য দুইটি ছিলো রোমান ও পারসিক, একটি খ্রিস্টান অপরটি অগ্নি উপাসক। সংখ্যায়, সম্পদে,

সামরিক বাহিনীর সংখ্যায়, অস্ত্রশস্ত্রে, এক কথায় সবদিক দিয়ে ঐ দুইটি বিশ্বশক্তি ছিলো ঐ শিশু জাতির চেয়ে বহুগুণে বড় কিন্তু তবুও তারা ঐ সদ্যপ্রসূত ছোট্ট জাতির সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হোয়ে গিয়েছিলো। খ্রিস্টান শক্তিটি পরাজিত হোয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকেই পালিয়ে গেলো; আর অগ্নি উপাসক শক্তিটি আল্লাহর দীনকে স্বীকার কোরে নিয়ে ঐ নতুন জাতির অর্ন্তভুক্ত হোয়ে গেলো; আজ যেটাকে আমরা ইরান বলি। তারপর ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ঐ জাতিটি তখনকার দিনের অর্ধেক পৃথিবী জয় কোরে আল্লাহর আইনের শাসনের অধীনে নিয়ে এলো।

জাতির উদ্দেশ্যচ্যুতি

আল্লাহর রসুল (দ:) বোলেছিলেন- আমার উম্মাহর (জাতির) আয়ু ৬০/৭০ বছর। এর প্রকৃত অর্থ হলো এই যে, তাঁর রসুল (দ:) জাতি ঐ ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত তার কাজ চালিয়ে গেছে। তারপর তারা ঐ কাজে বিরতি দিলো, কারণ ঐ উদ্দেশ্যটা ভুলে গেলো। তাদের দৃষ্টি, তাদের প্রকৃত লক্ষ্য, যে লক্ষ্য আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দ:) নির্দিষ্ট কোরে দিয়েছিলেন তা থেকে ঘুরে যেয়ে যে সহজ-সরল দীনকে সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার কথা সেটাকে চুলচেরা বিশ্লেষণের মধ্যে ব্যাপৃত হোয়ে পড়লো এবং আল্লাহ ও রসুলের (দ:) কথা মতই ধ্বংস হোয়ে গেলো। কিন্তু এই ধ্বংস হবার কারণ শুধু পণ্ডিতদের ঐ অতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই নয়। আরও একটি প্রধান কারণ আছে আর তা হলো এই দীনুল কাইয়্যেমাতে, সেরাতুল মোস্তাকীমের মধ্যে বিকৃত সুফী মতবাদ অর্থাৎ ভারসাম্যহীন অধ্যাত্মবাদের অনুপ্রবেশ। আল্লাহ মানুষের জন্য যত জীবনব্যবস্থা পাঠালেন যুগে যুগে, তাঁর শেষটাকে তিনি তৈরি কোরলেন একটা অপূর্ব ভারসাম্য (Balance) দিয়ে। এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্টই হলো ভারসাম্য। এর আগের দীনগুলিতে যে ভারসাম্য ছিলো না তা নয়, মূল দীনে ভারসাম্য অবশ্যই ছিলো। কারণ মানুষ শুধু দেহ নয় আত্মাও, শুধু সামাজিক জীব নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও আছে। তাই তাঁর জীবন-বিধান, দীনও একতরফা হোতে পারে না। সেটাকে অবশ্যই এমন হোতে হবে যে সেটা মানুষের উভয় রকম প্রয়োজনীয়তা পূরণ কোরতে পারে। নইলে সেটা ব্যর্থ হোতে বাধ্য। তাই আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা অবশ্যই সব সময় মূলতঃ ভারসাম্যযুক্ত ছিলো। কিন্তু পূর্ববর্তী সব নবীদের (আ:) উপর অবতীর্ণ দীনগুলি ছিলো স্থান ও কালের প্রয়োজনের মধ্যে সীমিত এবং ওগুলোর ভারসাম্যও ছিলো ঐ পটভূমির প্রেক্ষিতে সীমিত। কিন্তু ঐ দীনগুলির

ভারসাম্যও মানুষ নষ্ট কোরে ফেলেছে। হয় বিধানের আদেশ-নিষেধগুলিকে আক্ষরিকভাবে পালন কোরতে যেয়ে দীনের মর্মকে, আত্মাকে হারিয়ে ফেলেছে, না হয় দীনের সামাজিক বিধানগুলিকে যেগুলো মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা কোরবে সেগুলিকে ত্যাগ কোরে শুধু আত্মার উন্নতির জন্য সংসার ত্যাগ কোরে সন্ন্যাস গ্রহণ কোরেছে। উভয় অবস্থাতেই দীনের ভারসাম্য নষ্ট হোয়ে গেছে। ঐ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা কোরতে আল্লাহকে আবার প্রেরিত, নবী পাঠাতে হোয়েছে। শেষ যে জীবন-বিধান স্রষ্টা পাঠালেন তার শেষ নবীর (দ:) মাধ্যমে এটা এলো সমগ্র মানব জাতির জন্য। এর মধ্যে মানুষের সমষ্টিগত জীবনের জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইন, বিচার ও দণ্ডবিধিও যেমন রোইল, তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আত্মার উন্নতিরও ব্যবস্থা রোইলো। দু'টোই রোইলো- কিন্তু ভারসাম্যযুক্ত অবস্থায়। কোর'আনে স্রষ্টা এ ব্যাপারে পরিষ্কার কোরে বোলে দিলেন- আমি তোমাদের একটি ভারসাম্যযুক্ত জাতি কোরে সৃষ্টি কোরলাম (কোর'আন-সুরা আল-বাকারা ১৪৩)। এই আয়াতে আল্লাহ ভারসাম্য বুঝাতে যে শব্দটি ব্যবহার কোরছেন তা হোচ্ছে ওয়াসাত। আল্লামা ইউসুফ আলী এই শব্দের অনুবাদ কোরেছেন Justly balanced এবং Mohammed Marmaduke Pickthall অনুবাদ কোরেছেন Middle, অর্থাৎ মাঝখানে অবস্থিত। যে আয়াতে আল্লাহ এই জাতিকে ভারসাম্যযুক্ত কোরে তৈরি করার কথা বোলছেন তার ঠিক আগের আয়াতে তিনি সেরাতুল মোস্তাকীমের কথা বোলছেন। দীনুল কাইয়্যেমার, সেরাতুল মোস্তাকীমের ও ওয়াসাতের মূল অর্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রত্যেকটি শব্দের অর্থের মধ্যে সেই ভারসাম্য অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে। এই ওয়াসাত শব্দ ব্যাখ্যা কোরতে যেয়ে আল্লামা ইউসুফ আলী লিখছেন- আরবী ওয়াসাত শব্দটি আক্ষরিকভাবে মধ্যবর্তীতা অর্থ প্রকাশ করে (The Holy Quran- translation by Allama Abdullah Yousuf Ali/Note 143.)। এই ভারসাম্য যদি নষ্ট হোয়ে যায় অর্থাৎ যে কোন একদিকে ঝুঁকে পড়ে তবে যে কোন ব্যবস্থা নষ্ট হোয়ে যায়। অধ্যাত্মবাদ এই দীনে প্রবেশ কোরে এর ভারসাম্য নষ্ট কোরে দিলো কারণ এই মতবাদ এই জীবন-ব্যবস্থার সমষ্টিগত দিকটা, যার মধ্যে আল্লাহর দেয়া রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাগুলি রোয়েছে সেগুলোকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা কোরে এর শুধু ব্যক্তিগত ও আত্মার উন্নতির প্রক্রিয়াকে আঁকড়ে ধরাকেই ধর্মকর্ম সাব্যস্ত করলো। একদিকে পণ্ডিতরা ফকিহ, মুফাস্সেররা এই দীনের আইন-কানুনকে তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ কোরতে শুরু কোরলেন, অন্যদিকে সুফীরাও সব কিছু

সম্পূর্ণ ত্যাগ কোরে নিজেদের আত্মার ধোয়ামোছা পরিষ্কারের কাজে মগ্ন হোয়ে গেলেন। দু'দল দু'দিকে ঝুঁকে পড়লেন। ভারসাম্য আর রইল না, হারিয়ে গেলো। যে কাজের জন্য বিশ্বনবী (দ:) প্রেরিত হোয়েছিলেন, যে কাজের জন্য তাঁর উম্মাহ সর্বস্ব ত্যাগ কোরে পৃথিবীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, সে কাজ উপেক্ষিত হোয়ে পরিত্যক্ত হলো। জাতি দু'ভাগ হোয়ে দু'দিকে ঝুঁকে পড়লো, উম্মতে মোহম্মদী ঐ খানেই শেষ হোয়ে গেলো জাতি হিসাবে। এই যে দু'টি ভাগ হলো, দু'টি ভাগই হলো অন্তর্মুখী (Introvert)। ফকিহ মুফাস্সের ইত্যাদিরা বই, কেতাব, কলম, কাগজ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, আর সুফীরা তসবীহ নিয়ে হুজরায় আর খানকায় ঢুকলেন। বিশ্বনবী (দ:) ও তাঁর আসহাবদের অসমাপ্ত কাজ করার জন্য বিক্ষিপ্তভাবে কিছু সংখ্যক মাত্র লোক রোইলেন যারা এই জাতির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, সেরাতুল মোস্তাকীম ও দীনুল কাইয়্যেমাকে ভুললেন না। কিন্তু জাতি হিসাবে এই উম্মাহ আর উম্মতে মোহাম্মদীও রোইলো না সেরাতুল মোস্তাকীম, সহজ-সরল রাস্তায়ও রইলো না। এরই ভবিষ্যত বাণী কোরে শেষ নবী (দ:) বোলেছিলেন- আমার উম্মাহর আয়ু ৬০/৭০ বছর। কারণ তার (দ:) ওফাতের ৬০/৭০ বছর পরই এই মহা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছিল।

যেহেতু দীনুল কাইয়্যেমা, সেরাতুল মোস্তাকীম ও উম্মাতে ওয়াসাতা মূলতঃ একই অর্থ বহন করে অর্থাৎ ১) সহজ ও সরল, ২) মধ্যপন্থী, ৩) স্থির, নিশ্চিত, ৪) চিরস্থায়ী, শাশ্বত ও ৫) ভারসাম্যযুক্ত সুতরাং এটা পরিষ্কার হোয়ে যায় যে, এই ভারসাম্য (Balance) এই দীনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, কতখানি প্রয়োজনীয়। এক কথায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ দীনের প্রাণ এই ভারসাম্যের উপর নির্ভর করে। আল্লাহ এই ভারসাম্যের কথা শুধু বোলে দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, এর গুরুত্ব বোঝাবার জন্য তিনি আরও কাজ কোরেছেন। যার মাধ্যমে তিনি এই সহজ-সরল পথ (সেরাতুল মোস্তাকীম) আমাদের জন্য পাঠালেন তাঁকে অর্থাৎ তাঁর শেষ নবীর (দ:) পবিত্র দেহখানিও তিনি সৃষ্টি কোরলেন এক অপূর্ব ভারসাম্য দিয়ে। ইতিহাসবেত্তাদের ও বিভিন্ন হাদীসে এই সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের যে দৈহিক বর্ণনা পাওয়া যায়। সেগুলিকে একত্র কোরলে যে মানুষটাকে পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় তিনি বেশি লম্বাও ছিলেন না খাটোও ছিলেন না; দেহ ছিলো শক্তিমান, সুগঠিত কিন্তু মোটাও নয়, কৃশও নয়; গায়ের রং ইউরোপীয়ানদের মত ধবধবে সাদাও নয়, কালোও নয়, দুধে আলতায় মেশানো; মাথার চুল বেশি কুনচিতও নয়, একেবারে সোজাও নয়, মাঝারি ঢেউ খেলানো; এমন কি পবিত্র মুখখানাও গোলও ছিলো না, লম্বাও ছিলো না, ছিলো ডিম্বাকৃতি, যাকে পাশ্চাত্য ইতিহাসবেত্তারা

বর্ণনা কোরেছেন Oval শব্দ দিয়ে। সমস্ত কিছুই মাঝারি, কোনটাই বেশি নয়। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁর নবীর (দ:) পবিত্র দেহের মত তার দেয়া জীবন-ব্যবস্থাও ভারসাম্যযুক্ত, কোন কিছুরই অতিরিক্ততা নেই। এর যে কোন ব্যাপারেই একটু অতিরিক্ততা কোরলেই এর ভারসাম্য নষ্ট হবে এবং তা আর সেই নিখুঁত ভারসাম্যযুক্ত এসলাম থাকবে না। এই দীনকে অতি বিশ্লেষণ কোরে পণ্ডিতরা, ফকিহ ও মুফাস্সেররা এর ভারাসাম্য যেমন নষ্ট কোরে দিলেন, সেরাতুল মোস্তাকীমের, অতি সহজ-সরলতাকে মসলা-মাসায়েলের দুর্বোধ্য জটিলতায়, তেমনি অন্যদিকে সুফী সাধকরাও এর ভারসাম্য নষ্ট কোরে এর বহির্মুখী সংগ্রামী চরিত্রকে অন্তর্মুখী কোরে নিঃসাড় কোরে দিলেন, স্থবির কোরে দিলেন। এরা জীবনের নতুন লক্ষ্য স্থাপন কোরলেন। আল্লাহ তাঁর রসুলের (দ:) জন্য তাঁর (দ:) জীবনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট কোরে দিয়েছিলেন। কোর'আনে বোলেছিলেন- আল্লাহ তাঁর রসুলকে পাঠিয়েছেন পথ-প্রদর্শন ও সত্য দীন দিয়ে এই জন্য যে, তিনি পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য সমস্ত দীনগুলির উপর একে প্রতিষ্ঠা কোরবেন। তাঁর রসুলের জীবনের লক্ষ্য এত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বোলে দিয়েও সন্তুষ্ট না হোয়ে, এ যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাবার জন্য বোললেন- (এই কথার) সাক্ষী হিসাবে স্বয়ং আল্লাহই যথেষ্ট (কোর'আন- সুরা আল ফাতাহ ২৮)। আল্লাহর ভাষা থেকে মনে হয় যেন তিনি জানতেন, তাঁর রসুলের জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের মধ্যে মতভেদ হবে। তাই যেন তিনি বোলছেন যে, তোমাদের মধ্যে যত মতভেদই হোক, আসলে তাঁর জীবনের লক্ষ্য কি তা আমি বোলে দিলাম ও এর সত্যতা সম্বন্ধে আমি স্বয়ং সাক্ষী রইলাম। এই সত্য উপলব্ধি কোরে বিশ্বনবী (দ:) ঘোষণা কোরলেন- আমি আদিষ্ট হোয়েছি (আল্লাহ কর্তৃক) যে, আমি যেন সমস্ত মানব সমাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাই যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহকে একমাত্র প্রভু (এলাহ) বোলে এবং মোহাম্মদকে তাঁর প্রেরিত বোলে স্বীকার করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত প্রদান করে (The Holy Quran- translation by Allama Abdullah. Yousuf Ali/Note 143.)। এখানে আমি 'সশস্ত্র সংগ্রাম' অনুবাদ কোরেছি এইজন্য যে, বিশ্বনবী (দ:) শব্দ ব্যবহার কোরেছেন কিতাল, যার অর্থ অস্ত্র হাতে যুদ্ধ। আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অকাট্য বাণী থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে রসুলাল্লাহর (দ:) জীবনের উদ্দেশ্য কী ছিলো। এখানে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় আবার এসে যাচ্ছে। তা হলো- যে জীবনের লক্ষ্য এই বিশাল পৃথিবীতে এক আদর্শ, এক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। সে জীবন

অতি অবশ্যই হবে বহির্মুখী (Extrovert), সে জীবনের দৃষ্টি হবে বহির্মুখী, এবং হোয়েছেও তাই। তাঁর সম্পূর্ণ জীবনটাই বহির্মুখী। শুধু তাই নয়, তিনি যে জাতিটি সৃষ্টি কোরলেন তারও জীবন হলো বহির্মুখী। স্বভাবতঃই, কারণ আল্লাহ তাঁর নবীর উপর যে কাজের ভার চাপিয়ে দিলেন এবং নবীর (দ:) পর যা তাঁর উম্মাহর উপর চাপলো সে কাজটাই তো বহির্মুখী, সমস্ত পৃথিবীর উপর এই দীন স্থাপন করা। কাজেই আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই যে, রসুলের (দ:) ও তাঁর সৃষ্ট উম্মাহর চরিত্রকে শুধু বহির্মুখী বলা যথেষ্ট হয় না, বোলতে হয় বিস্ফোরণমুখী (Explosive)। বিশ্ব নবীর (দ:) জীবিত কালে প্রথম বিস্ফোরণ সমস্ত আরবকে আচ্ছন্ন কোরে দিলো এবং তাঁর (দ:) ওফাতের পর তাঁর উম্মাহর বিস্ফোরণ আটলান্টিক মহাসাগরের তীর থেকে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত আচ্ছাদিত কোরে দিল।

বোলছিলাম, এই সুফী সাধকরা এসলামের দেহ ও আত্মার, শরিয়াহ ও আধ্যাত্মিকতার ভারসাম্য নষ্ট কোরে দিলেন। কেমন কোরে এই ভারসাম্য নষ্ট কোরলেন সেইটা এখন বিবেচ্য। আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দ:) জাতির সামনে যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট কোরে দিয়েছিলেন এই অধ্যাত্ম সাধকরা সেটা বদলিয়ে নতুন লক্ষ্য স্থাপন কোরলেন। সেটা হলো বিশেষ প্রক্রিয়ায় সাধনা কোরে, আত্মাকে উন্নত কোরে

আল্লাহর রসুলের হাতে গড়া উম্মতে মোহাম্মদী ছির বহির্মুখী, বিস্ফোরণমুখী একটি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতি যাদের হাতে চুরমার হোয়ে গিয়েছিল অর্ধ-দুনিয়ার সকল বিশ্বশক্তির সামরিক বাহিনী।

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ, এবং তা কোরতে ঐ বিশেষ প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপই হলো লোক সান্নিধ্য, জনসম্পৃক্ততা বর্জন কোরে নির্জনতা বেছে নেয়া। অর্থাৎ রসুলাল্লাহ (দ:) তাঁর জাতির, উম্মাহর যে বহির্মুখী সংগ্রামী চরিত্র সৃষ্টি কোরেছিলেন তার ঠিক বিপরীতমুখী- এক কথায় অন্তর্মুখী। অন্যান্য ধর্মের আধ্যাত্মিক সাধকরা তাদের সাধনার প্রক্রিয়ার মাল-মশলা, উপাদান তাদের যার যার ধর্মগ্রন্থগুলি থেকে সংগ্রহ কোরেছিলেন। এ ধর্মের সুফী-সাধকরাও কিছু কিছু মাল-মশলা কোর'আন-হাদীস থেকে খুঁজে বের কোরলেন। খুব বেশি কিছু পেলেন না, কারণ এ জীবনব্যবস্থা সংগ্রামী, নির্জনে বোসে সাধনার কোন ব্যবস্থা এতে নেই। সেজন্যই মহানবী বোলেছেন, এসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই। কিন্তু যেহেতু এ দীন ভারসাম্যযুক্ত, দেহ ও আত্মার উভয়ের উন্নতির ব্যবস্থা এতে আছে, কাজেই আত্মার দিকের যেটুকু আছে ঐ টুকুকেই তারা আলাদা কোরে নিয়ে নিলেন এবং তাতে যোগ কোরলেন কিছু প্রক্রিয়া, যা তারা অন্যান্য ধর্মের প্রক্রিয়া থেকে নিলেন ও কিছু নিজেরা তৈরি কোরে নিলেন। ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হোয়ে গেলো। এই দীনে মানুষের আত্মার উন্নতির যে অংশটুকু আছে তাকে যদি মা'রেফাত বোলে ধোরে নেওয়া যায় তবে এ দীন হলো শরিয়াহ ও মা'রেফাতের মিশ্রণে একটি পূর্ণ ব্যবস্থা। মানুষ এক পায়ে হাটতে পারে না, তাকে দু'পায়ে ভারসাম্য কোরতে হয়। দীনেরও দু'টি পা। এক পা শরিয়াহ অন্য পা মারেফাত। এই দুই পায়ের সহযোগিতায় একটা মানুষ ভারসাম্য রেখে হাটতে পারে। একটা জাতির বেলায়ও তাই। ঐ দুই পায়ের একটা বাদ দিলে বা নিষ্ক্রিয় হোয়ে গেলে ঐ জাতিও আর হাটতে পারবে না, তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যেও পৌঁছতে পারবে না। সুফী-সাধকরা এই দীনের মারেফাতের পা'টাকে আঁকড়ে ধোরলেন। অবশ্য শরিয়াহর পায়ের যেটুকু ব্যক্তিগত পর্যায়ের সেটুকু আংশিকভাবে গ্রহণ কোরলেন। কিন্তু এ দীনের শরিয়াহ প্রধানতই জাতীয়; রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ও দণ্ডবিধিই এর প্রধান ভাগ। এই প্রধান অংশটুকুকে বাদ দিয়ে শুধু ব্যক্তিগত শরিয়াহ ও আত্মার উন্নতির অংশটুকু গ্রহণ কোরে নির্জনবাসী হোয়ে সুফীরা এই দীনের একটা পা কেটে ফেললেন। ফলে এ দীন স্থবির হোয়ে গেলো, চলার শক্তি হারিয়ে ফেললো। যে জিনিসের গতি নেই সেটা মৃত, গতিই প্রাণ। এক পা হারিয়ে এই জাতি চলার শক্তি হারালো তার পর ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। যে জাতি শরিয়াহ আর মারেফাতের দু'পায়ে হেঁটে আরব থেকে বের হোয়ে আটলান্টিকের তীর আর চীনের সীমান্ত পর্যন্ত গেলো, সে জাতি ফকিহ, মুফাসসের আর সুফীদের কাজের ফলে চলার শক্তি হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।

একদল জাতিকে খণ্ড বিখণ্ড কোরল, অন্যদল জাতির বহির্মুখী গতিকে উল্টিয়ে অন্তর্মুখী বা ঘরমুখী কোরে দিল।

সুফি সাধক আর পণ্ডিত তৈরি করা শেষ দীনের লক্ষ্য নয়

সুফীদের যে উদ্দেশ্য চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক উন্নতি তা জাতিগতভাবে অসম্ভব। একটা জাতির অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ নির্জনের বা হুজরায় বোসে ব্যক্তিগতভাবে আত্মিক উন্নতি কোরতে পারে এবং ব্যক্তিগতভাবে তার ফলও ভোগ কোরতে পারে। কিন্তু তাতে জাতি উপকৃত হোতে পারে না- পারলেও তা অতি সামান্য। যদি ঐ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভই এই উম্মাহর একমাত্র উদ্দেশ্য হতো, তবে মহানবীর (দ:) জীবনটাই অন্য রকম হতো। তিনি তাহলে একটা একটা কোরে মানুষ মুরীদ কোরে তাকে হুজরায়, খানকায় বসিয়ে দিতেন নামায, তাসবিহ, মোরাকেবা, মোশাহেদা আর যিকর দিয়ে, বর্তমানের ধর্মীয় নেতাদের মত। তারা যা কোরছেন তা কোরলে তদানিন্তন মোশরেক ও কাফের সমাজের সাথে রসুলাল্লাহর কোন সংঘর্ষও হতো না, যুদ্ধও হোত না, তাঁকে ও তাঁর আসহাবগণকে না খেয়ে থাকতে হোত না, অপবাদ ও নির্যাতনের শিকার হোয়ে দেশত্যাগ কোরতে হোত না। কারণ তখনকার মূর্তিপূজক আরব সমাজে খ্রিস্টান ছিলো, ইহুদী ছিলো, এমনকি তাসাওয়াফ প্রক্রিয়া তরিকা অনুশীলনকারী লোকও ছিলো। তদানিন্তন মোশরেক আরবরা তাদের বিরুদ্ধাচরণ কোরত না, তাদের সাথে মিলেমিশে বাস কোরত, এটা ইতিহাস। কাজেই বিশ্বনবী (দ:) যদি নতুন একটি তরিকা উদ্ভাবন কোরে তাতে লোক ভর্তি শুরু কোরতেন এবং তাদের আল্লাহর নৈকট্য লাভের আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া শিক্ষা দিতেন তবে নিশ্চিত বলা যায় যে, মোশরেক সমাজ তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ কোরতো না। হযরত ওয়ায়েস করনী (রা:) শেষ নবীর (দ:) নতুন জীবন-বিধান প্রচারের অনেক আগে থেকেই তাসাওয়াফ সাধনা কোরতেন। মোশরেক আরবরা তাকে কোন রকম বাধা দিয়েছে বা উত্যক্ত কোরেছে বোলে কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু বিশ্বনবী (দ:) তা করেন নি। তিনি এমন এক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, জেহাদ আরম্ভ কোরলেন যা আইন ও তাসাওয়াফের, শরিয়াহ ও মারেফাতের ভারসাম্যযুক্ত। এর প্রথম ও প্রধান অংশ হলো আইন, যার মধ্যে মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সর্বরকম বিধান রোয়েছে। মোশরেক আরব সমাজ বিশ্বনবীর (দ:) কার্যপ্রণালী থেকে শীগগীরই বুঝতে পারলো যে,

যে জাতিকে আল্লাহর রসুল যুদ্ধের মাঠে রেখে বিদায় নিলেন, সেই জাতির বিরাট একটি অংশ পরবর্তীতে বিভিন্ন বিকৃত মারেফতী তরিকার অনুসারী হোয়ে অন্তর্মুখী হোয়ে গেল। তারা ভুলে গেল যে রসুলাল্লাহ সুফিসাধক তৈরি করার জন্য পৃথিবীতে আসেন নি।

তাসাওয়াফের মাধ্যমে স্রষ্টার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন কোরে তাঁর নৈকট্য লাভের প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়া মোহাম্মদের (দ:) লক্ষ্য নয়, তাঁর উদ্দেশ্য হোচ্ছে তাদের সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে সেখানে নতুন আইন, নতুন সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপন করা- একটা সম্পূর্ণ নতুন রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। তাই তারা বিশ্বনবীর (দ:) বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো।

প্রশ্ন আসে তবে কি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের প্রয়োজনীয়তা এ দীনে নেই? আছে, আগেই বলেছি এ দীন ভারসাম্যযুক্ত, কাজেই দুটোই আছে। কিন্তু প্রথম হলো পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত কোরে শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠা কোরে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা। প্রথমটা ফরজ, দ্বিতীয়টা নফল। ফরদ নামায বাদ দিয়ে শুধু সুন্নত বা নফল নামায পড়লে শরিয়াহ মোতাবেকই তা যেমন নাজায়েয, ঠিক তেমনি বিশ্বনবীর (দ:) উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্বকে পূর্ণ করার ফরদ কাজ বাদ দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রক্রিয়া অর্থাৎ নফল কাজ নিয়ে ব্যস্ত হোলে তা ঐ শরিয়াহ মোতাবেকই জায়েয হবে না। প্রথমে ফরজ তারপর ওয়াজেব, তারপর সুন্নাহ, তারপর নফলও

তারপর মোস্তাহাব। এ ধারাবাহিকতার গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রণালী (Priority) আল্লাহ ও তার রসুলই (দ:) বিধিবদ্ধ কোরে দিয়েছেন। সুতরাং তা ভঙ্গ কোরে অগ্রাধিকারের গুরুত্বের (Priority) ওলট-পালট যায়েজ হবে না। শুধু তাই নয় আল্লাহর হাবীবের (দ:) সুন্নাহ অর্থাৎ পৃথিবীতে এই দীনকে প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রাম বাদ দিয়ে আল্লাহর নেকট্য লাভের চেষ্টা আল্লাহ মঞ্জুর কোরবেন কি? কারণ বিশ্বনবী (দ:) প্রদর্শিত পথ ছাড়া মোসলেমের, মো'মেনের জন্য অন্য আর কোন পথ (তরিকা) নেই। মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ (দ:) শুধু মোসলেমের নয়, সমস্ত মানব জাতির একমাত্র আশা, একমাত্র ভরসা। ঐ একটি মানুষই আল্লাহ সৃষ্টি কোরেছেন যাকে সমস্ত মানব জাতির মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হবে কিয়ামতের দিনে। অন্যান্য সমস্ত নবীদের দেয়া হবে শুধু তাদের যার যার উম্মাহর মুক্তির জন্য সুপারিশের অনুমতি। আল্লাহর নৈকট্য লাভ যদি এই শেষ জীবন-ব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য হতো তবে বলবো এটা মাত্র গুটি কয়েকজন লোকের জন্য এসেছে। কারণ কোটিতে একজন লোক পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ যিনি তাসাওয়াফের প্রক্রিয়ায় সাধনা রেয়াযাত কোরে স্রষ্টার নৈকট্য বা তাঁর সাথে মিশে যেতে পেরেছেন। দু'চার কোটিতে একজন কোরে এমন লোক, যিনি ফানা-ফিল্লাহ বা বাকি-বিল্লাহর স্তরে পৌঁছতে পেরেছেন, সুফী তৈরি করাই যদি রসুলাল্লাহর (দ:) উপর দায়িত্ব হতো তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁর সম্পূর্ণ জীবনটাই অন্য রকম হতো, তাঁর শিক্ষাও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হতো। তিনি তাহোলে কঠোর অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম, কোরে যে জাতি সৃষ্টি কোরলেন যারা ছিল লোহার মত ঐক্যবদ্ধ, শৃঙ্খলায় অতুলনীয়, নেতার আনুগত্যে প্রাণোৎসর্গকারী একটি জাতি, একটি উম্মাহ সৃষ্টি কোরতেন না, বরং একটি সুফী তরিকার উদ্ভাবন কোরতেন। যে সশস্ত্র সংগ্রাম তিনি সারা জীবন ধোরে কোরলেন তার প্রয়োজন হতো না।

মহাসাধক ওয়ায়েস করনী (রা:) যুদ্ধে শহীদ হন

শেষ এসলামের ভারসাম্য নষ্ট কোরে এই সুফীর দল যাকে আদর্শ হিসাবে বেছে নিলেন তিনি বিশ্বনবী (দ:) নন, তিনি মহাসাধক ওয়ায়েস করনী (রা:), যিনি রসুলাল্লাহর (দ:) নুবয়াত পাওয়ার অনেক আগে থেকেই আত্মিক উন্নতি অর্থাৎ তাসাওয়াফের সাধনা কোরে অতি উচ্চ স্তরে (মাকামে) অধিষ্ঠিত হোয়েছিলেন। শেষ প্রেরিতের নবুয়াত পাওয়ার আগে থেকেই যিনি সাধনা কোরছিলেন

তিনি কী প্রক্রিয়ায় সাধনা কোরছিলেন? নিশ্চয়ই মহানবীর (দ:) শেখানো পদ্ধতিতে নয়, হয় খ্রিস্টান বা ইহুদী বা বৌদ্ধ বা হিন্দু বা অন্য যে কোন পূর্ববর্তী ধর্মের পদ্ধতি হবে। তা সত্ত্বেও তার সাধনা যে সম্পূর্ণ সফল ছিলো তার প্রমাণ তার জীবনী এবং বিশেষ কোরে এই যে, মহানবী (দ:) তাঁর পবিত্র জোব্বা (Robe) তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু ওয়ায়েস করনী (রা:) বিশ্বনবীর (দ:) জীবনের কর্ম প্রবাহে যোগ দেন নি, এমন কি তাঁর (দ:) সাথে তাঁর দেখাই হয় নি। মহানবী (দ:) আল্লাহর কাছ থেকে যে মহাদায়িত্ব নিয়ে এসে এবং তা পালন কোরতে যে অবিশ্বাস্য দুঃখ, দুর্দশার সংগ্রামের জীবন অতিবাহিত কোরলেন, তাতে ওয়ায়েস করনী (রা:) অংশ নেন নি- মা কে ছেড়ে আসতে হয় বোলে। আবু বকর (রা:) থেকে শুরু কোরে হাজার হাজার আসহাব তাদের শুধু মা কে ছেড়ে নয়, বাপ-মা, স্ত্রী-পুত্র, কন্যা, সম্পত্তি, বাড়ী-ঘর হেলায় ত্যাগ কোরে এসে মহানবীর (দ:) সঙ্গী হোয়েছেন, তার সঙ্গে সব রকম দুঃখ বরণ কোরেছেন। বছরের পর বছর ছায়াহীন উত্তপ্ত মরুভূমিতে কাটিয়েছেন, বিশ্বনবীর (দ:) দায়িত্ব পূরণের সশস্ত্র সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। সুফীরা ওহোদের যুদ্ধে বিশ্বনবীর (দ:) পবিত্র দাঁত ভেঙ্গে যাওয়ার খবরে ওয়ায়েস করনী (রা:) নিজের দাঁত ভেঙ্গে ফেলাকে ভালবাসার চূড়ান্ত পরিচয় হিসাবে পেশ করেন। নিজের দাঁত ভেঙ্গে ফেলা বেশি ভালবাসার পরিচয়, না প্রিয় নেতার জীবন রক্ষার জন্য তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে শত্রুর অজস্র তীর নিজেদের শরীর দিয়ে ঠেকিয়ে তীরে তীরে সজারুর মত হোয়ে যাওয়া বেশি ভালবাসার পরিচয়? শত্রুর আক্রমণ থেকে বিশ্বনবীকে (দ:) রক্ষা কোরতে জীবন পণ কোরে যুদ্ধ কোরে মারাত্মক আহত হোয়ে প্রাণের চেয়ে প্রিয় নেতার পবিত্র পায়ের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে মরে যাওয়া কতখানি ভালবাসার প্রমাণ? ওহুদের যুদ্ধে রসুলাল্লাহর আনুগত্য লংঘন করার কারণে মোসলেম বাহিনীর উপর সাংঘাতিক বিপর্যয় নেমে আসে। একটি সময় মোশরেক বাহিনী রসুলাল্লাহকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললে তিনি বোললেন, “এমন কে আছ, যে আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য জীবন কোরবানী কোরতে প্রস্তুত?” এ কথা শুনে পাঁচজন আনসার সাহাবী এগিয়ে এলেন এবং রসুলাল্লাহ হেফাজতের জন্য এক একজন কোরে লড়াই কোরে শহীদ হোতে লাগলেন এবং রসুলাল্লাহর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়তে লাগলেন। সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন যিয়াদ বিন সাকানা (রা:)। তিনিও বীর বিক্রমে লড়াই কোরে গুরতর আহত হোলেন। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন মোজাহেদ সেখানে ফিরে এলেন এবং আহত সাহাবীর পক্ষে লড়াই কোরে শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত কোরে হটিয়ে দিল। রসুলাল্লাহ আহত যিয়াদকে (রা:) দেখিয়ে বোললেন, ‘ওকে আমার কাছে আনো।”

তাকে আনা হোলে রসুলাল্লাহ নিজ জানুর উপর তাকে মাথা রেখে শোয়ালেন। এ অবস্থাতেই উক্ত সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। আর যদি দাঁতের কথাই তুলেন তবে রসুলুল্লাহর (দ:) মাথায় ঢুকে যাওয়া শিরস্ত্রাণের পেরেক পাগলের মত কামড়িয়ে টেনে তুলতে যেয়ে আবু ওবায়দার (রা:) কয়েকটা দাঁত ভেঙ্গে ফেলার কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? ঐ ওহোদের যুদ্ধেই। লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র যে দশজন লোককে আল্লাহর সম্পূর্ণ ক্ষমা ও জান্নাতের সুসংবাদ তাদের জীবিতকালেই দেয়া হলো আবু ওবায়দা (রা:) তাদের অন্যতম- ওয়ায়েস করনী (রা:) নন। রসুলাল্লাহর (দ:) নিজের ব্যবহৃত খেরকা (Robe) ওয়ায়েস করণীকে (রা:) উপহার দেওয়াও এদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের চিহ্ন হিসাবে বিবেচিত। বহু বইয়ে পড়েছি, বহু ওয়াজে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনেছি। কিন্তু বিদায় হজ্বে। মাথার চুল কামিয়ে সমস্ত পবিত্র চুলটুকু যে মহানবী (দ:) আল্লাহর তলোয়ার খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা:) কে উপহার দিয়েছিলেন এবং খালেদ (রা:) যে সেই মহাপবিত্র চুলগুচ্ছ তার টুপির মধ্যে সেলাই কোরে নিয়েছিলেন এবং প্রতিটি যুদ্ধে তিনি শিরস্ত্রাণের নিচে সেই টুপি পড়তেন- কই, কোন ওয়াজে, কোন বক্তৃতায় তো তা শুনি না। কাপড়ের তৈরি খেরকা উপহার দেয়া বেশি মেহেরবাণীর চিহ্ন না নিজের দেহের অংশ, মাথার চুল উপহার দেয়া বেশি স্নেহের, বেশি প্রেমের চিহ্ন? ওয়ায়েজরা খালেদকে (রা:) রসুলাল্লাহর চুল উপহার দেবার কথা বলেন না- বলেন ওয়ায়েসকে (রা:) খেরকা উপহার দেয়ার কথা কারণ খালেদ (রা:) তাঁর সমস্ত কিছু নিজের প্রাণ আল্লাহর ও তাঁর রসুলের (দ:) জন্য উৎসর্গ কোরে অস্ত্র হাতে সংগ্রাম কোরে গেছেন সারা জীবন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের কয়েকদিন পূর্বে জনৈক ঘনিষ্ঠ বন্ধু খালিদের সঙ্গে সাক্ষাত কোরতে আসে। তিনি ডান পায়ের কাপড় তুলে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেন, “তুমি কি আমার পায়ে এমন এক বিঘত জায়গাও দেখতে পাও যেখানে তরবারী তীর বা বর্শার আঘাত নেই?” বন্ধু খালিদের পা পরীক্ষা কোরে না সূচন উত্তর দেয়। তখন খালিদ (রা:) বাম পায়ের কাপড় তুলে একই প্রশ্ন করেন এবং আবারও একই উত্তর আসে। এরপর খালিদ (রা:) প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত তুলে বন্ধুর সামনে মেলে ধরেন। বন্ধু হাত দুটি পরীক্ষা করে এবং একই অবস্থা দেখতে পায়। এবারে খালিদ (রা:) তাঁর বিশাল বক্ষদেশ উন্মোচিত করেন। যার শক্তিশালী পেশীগুলি অসুস্থতার কারণে শিথিল হোয়ে গেছে। বন্ধুটি খালিদের ক্ষত বিক্ষত বক্ষদেশের অবস্থা দেখে বিষ্ময়ে হতবাক হোয়ে যায়। একজন মানুষ বুকে এতটা আঘাত পেয়েও কিভাবে বেঁচে থাকতে পারে! এ ক্ষেত্রেও সে আঘাতহীন এক বিঘত জায়গাও খুঁজে পায় না। তখন খালেদ (রা:) কাতর কন্ঠে বলেন, “শহীদ হওয়ার জন্য

আমি এক রণাঙ্গণ থেকে আরেক রণাঙ্গণে ছুটে বেড়িয়েছি। যেখানেই দেখেছি কাফেরদের ব্যুহ সবচেয়ে শক্তিশালী ও সুগঠিত সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়েছি। তবু কেন আল্লাহ আমাকে শাহাদাত দিলেন না?" এই হোল প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর জীবন। এই খালেদ (রা:) যাকে রসুলাল্লাহ "আল্লাহর তলোয়ার" উপাধিতে ভূষিত কোরেছিলেন তার কথা ওয়ায়েজরা উচ্চারণ করেন না, কারণ তিনি রসুলাল্লাহর যে সুন্নাহ অনুসরণ কোরে 'সাইফুল্লাহ' হোয়েছিলেন তা পালন কোরতে গেলে বড় কষ্ট, বড় কোরবানী, বড় জানের বিপদ। ওয়ায়েসের (রা:) কথা সর্বত্র বলেন কারণ হুজরায় বোসে আধ্যাত্মিক সাধনায়, নফল নামায, রোযায়, তসবিহ টানতে বিপদের আশংকা নেই।

সাবধান! আমি ওয়ায়েস করনীকে (রা:) ছোট করার জন্য এসব বোলছি বোলে কেউ মনে কোরবেন না। যে ভারসাম্য বিনষ্ট হোয়ে, যে আকীদা বিকৃত হোয়ে যেয়ে আজ এই জীবনব্যবস্থা পৃথিবীতে অবহেলার জিনিস হোয়ে গেছে, এই জাতি আল্লাহ রসুলের (দ:) চোখে কার্যত মোশরেক, কাফের হোয়ে গেছে- সেই ভারসাম্য, সেই আকীদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যই আমি লিখছি। আমি ওয়ায়েস করনীকে (রা:) ছোট করার জন্য লিখতে পারি না। কারণ যাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব, আল্লাহর রসুল (দ:) তার ব্যবহৃত কাপড় উপহার দিয়েছেন তাকে কোন রকম ছোট করা কোন মোসলেমের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া পরবর্ত্তীকালে এই মহাসাধক প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী হবার অর্থ কি তা উপলব্ধি কোরতে পেরেছিলেন বোলেই নির্জনতা ত্যাগ কোরে উম্মাহর বহির্মুখী জীবন প্রবাহে যোগ দিয়েছিলেন এবং অস্ত্র হাতে জেহাদে নেমে শহীদ হোয়েছিলেন। অর্থাৎ এই ভারসাম্যযুক্ত জীবন-ব্যবস্থার দুটো দিকেই তিনি কামেলিয়াত, সিদ্ধিলাভ কোরলেন। আমি যা বোলতে চেষ্টা কোরেছি, ওয়ায়েস করনীর (রা:) জীবন তারই দৃষ্টান্ত। কাজেই তাকে কি কোরে ছোট কোরতে পারি? তাকে ছোট কোরছেন ভারসাম্যহীন সুফীরা।

খিদির (আ:) এর অতিমানবীয় বৈশিষ্ট্য

আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ, আত্মার উন্নতি করাটাই যারা এসলামের সবটুকু মনে করেন বা অন্ততঃ প্রধান অংশ ও কর্তব্য মনে করেন তারা তাদের যুক্তির পক্ষে কোর'আনে বর্ণিত খিদিরের (আ:) ঘটনা উল্লেখ করেন। প্রথম কথা হলো- সমস্ত ব্যাপারটা সাধারণ

নয়- অসাধারণ। আল্লাহ তাঁর অসীম ও সর্বব্যাপী শক্তি দিয়ে তাঁর এই বিপুল সৃষ্টিকে চালনা করেন। কেমন কোরে তা করেন সে জ্ঞান তিনি ছাড়া আর কারোরই নেই। মুফাস্সেরদের মতে কোর'আনে বর্ণিত ঘটনাটার কারণ হলো এই যে, একবার মুসার (আ:) মনে এই ধারণা হলো যে, যেহেতু তিনি আল্লাহর নবী কাজেই সব রকম জ্ঞানই তাঁকে দেয়া হোয়েছে এবং তাঁর চেয়ে বেশি জ্ঞানী আর কেউ নেই। তাঁর এই ভুল ধারণা অপনোদন করার জন্য আল্লাহ তাঁকে খিদিরের (আ:) সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলেন এবং মুসার (আ:) ভুল ভাঙ্গলো। আল্লাহ যে রহস্যময়ভাবে তঁর সৃষ্টি পরিচালনা করেন খিদির (আ:) তাঁর একটি মাধ্যম মাত্র। আর নবুয়াত হলো মানুষ কেমন কোরে পৃথিবীতে শান্তিতে অর্থাৎ এসলামে বাস কোরবে সেই জীবন-ব্যবস্থার জ্ঞান ও শিক্ষা। দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার, ভিন্ন জ্ঞান। এই দুটো জ্ঞানের মধ্যে নবীদের মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া জ্ঞানই হোচ্ছে আমাদের জন্য। স্রষ্টা কেমন কোরে তাঁর সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করেন তা জাতি অর্থাৎ নবীদের উম্মাহ হিসাবে আমাদের জন্য নয়। তা না হলে মুসাকে (আ:) নবী না কোরে আল্লাহ তো খিদির (আ:) কেই নবী বানাতে পারতেন এবং তা হোলে খিদিরের (আ:) ঐ বিশেষ জ্ঞানই তাঁর উম্মাহর জন্য নির্দিষ্ট হোয়ে যেতো। দ্বিতীয়তঃ খিদিরকে (আ:) চিরজীবি বলা হয়। আল্লাহ বোলেছেন- প্রত্যেক জীবকে মরতে হবে (কোর'আন- সুরা আলে ইমরান ১৮৫, আন নিসা ৭৮)। খিদির যদি চিরজীবী হোয়ে থাকেন তবে প্রশ্ন উঠে তিনি আমাদের মত মানুষ বা কোন জীব কিনা তার নাম খিদির অর্থাৎ সবুজ বা চির সবুজ- নামটাই তো এ ব্যাপারে সন্দেহজনক। তৃতীয়তঃ খিদিরের (আ:) জ্ঞান হলো এক বিশেষ জ্ঞান, যাকে বলা যায় Specialised Knowledge কিন্তু বিশেষ বোলেই সেটা মুসার (আ:) জ্ঞানের চেয়ে উচ্চতর কিছু তা মনে করার কোন কারণ নেই। ধরুন কোন দেশ বা জাতির সর্বময় প্রধান, তিনি জ্ঞানী, গুণী, সুশাসক, সুবিচারক। তার জাতির মধ্যে অনেক বিশেষ গুণধারী মানুষ আছেন। চিকিৎসক আছেন, প্রকৌশলী, নৌবিদ্যা বিশারদ, সামরিক বিশেষজ্ঞ, সেচ বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি আছেন। ঐ শাসক ঐ সব বিশেষজ্ঞদের সব জ্ঞানের অধিকারী নন- কিন্তু তাই বোলে তিনি যে জাতির সর্বময় কর্তা তা বদলাবে না। ঐ বিশেষজ্ঞরা তাদের যার যার জ্ঞান ঐ শাসককে শেখাতে পারেন। কিন্তু তারা তাদের ঐ বিশেষ জ্ঞান (Specialised Knowledge) নিয়েও ঐ শাসকের অধীন, তার আদেশ অনুযায়ী চলেন। চতুর্থ কথা হলোঃ খিদির (আ:) মুসাকে (আ:) যে কয়টি কাজ কোরে দেখালেন সেগুলির প্রতি লক্ষ্য কোরে দেখুন। নৌকা ছিদ্র কোরে একজনের

নৌকাটা রক্ষা কোরলেন। একটা ছেলেকে হত্যা কোরে তার বাপ মাকে এক ভবিষ্যত দুষ্কৃতিকারী সন্তানের হাত থেকে রক্ষা কোরলেন এবং একটি দেয়াল মেরামত কোরে একজনের সম্পত্তি রক্ষা কোরলেন। এই তিনটি কাজের প্রত্যেকটিই ব্যক্তিগত ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোনটিই জাতিগত অর্থাৎ বৃহত্তর নয়। অন্যদিকে মুসার (আ:) কাজ ছিলো জাতির জন্য এমন এক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেটার প্রতিষ্ঠা হোলে হয়ত জবর দখলকারী ঐ রাজারই অস্তিত্ব থাকতো না, ঐ দুষ্কৃতিকারী ছেলে দুষ্কৃতিকারী হতো না এবং এমন সমাজ সৃষ্টি হতো যে সমাজ ঐ ইয়াতীম বালকের সম্পদ রক্ষা কোরে যথা সময়ে তাকে দিয়ে দিতো। আসল কথা হলো কোর'আনে ঐ ঘটনা মুসার (আ:) নিজের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেয়ার জন্য। ওটাকে যদি আমাদের প্রধান কর্তব্য বোলে নিয়ে ঐ নিয়ে মাতামাতি করি তবে পথভ্রষ্ট হোতে হবে।

তাসাওয়াফ কি?

তাহলে সুফীদের প্রবর্তিত এই -তাসাওয়াফ কি? আদম (আ:) থেকে শেষ নবী (দ:) পর্যন্ত আল্লাহ এই দীন-এ এসলাম পাঠিয়েছেন একটা ভারসাম্য দিয়ে। প্রত্যেকটিতে একদিকে যেমন মানুষের জন্য রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বিধান রোয়েছে-তেমনি তার আত্মার উন্নতির প্রক্রিয়াও রোয়েছে। দু'দিকেই সমান এবং একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা একেবারে অচল। মানুষ যেমন দু'পায়ে চলে, এক পায়ে চোলতে পারে না, দীনও একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা একা চোলতে পারে না। আত্মার উন্নতির প্রক্রিয়া পূর্ববর্তী সমস্ত দীনেই ছিলো, বিকৃত অবস্থায় আজও আছে এবং ঐ পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর প্রক্রিয়ায় সাধনা কোরলে আজও ফল পাওয়া যায়। আজও অন্যান্য ধর্মে অতি শক্তিশালী মহাসাধকরা আছেন যাদের কেরামত অলৌকিক ক্ষমতা মোসলেম ওলী, আওলিয়াদের চেয়ে কম নয়। যে কেউ-ই নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সাধনা কোরলে তার ফল পাবে, তার আত্মার শক্তি বৃদ্ধি পাবে, অদৃশ্যের, গায়েবের অনেক খবর তার কাছে আসবে,

সাধারণ মানুষ যা পারে না তেমন কাজ করার ক্ষমতা জন্মাবে, এক কথায় তাসাওয়াফের বই-কেতাবে যে সব উন্নতির কথা লেখা আছে সবই হবে। কিন্তু এগুলি শেখাতে বিশ্বনবী (দ:) আসেন নি। এই উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফী ও আলেম, হাকীম-আল-উম্মাহ আশরাফ আলী থানভী (রা:) লিখেছেন- "মানব শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেমন জাহিরী (প্রকাশ্য) শক্তি রহিয়াছে। সেইরূপে মানুষের রূহের (আত্মার) মধ্যে অনেক বাতেনী (গুপ্ত) শক্তি নিহিত আছে। শরীর চর্চার মাধ্যমে যেমন মানুষের অঙ্গ-প্রতঙ্গ শক্তিশালী হইয়া উঠে, তদ্রƒপ আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা তাহাদের রূহানী শক্তি বৃদ্ধি পায় (সংক্ষিপ্ত এসলামী বিশ্বকোষ- এসলামিক ফাউণ্ডেশন-১ম খণ্ড ৭৬ পৃ:)। আশরাফ আলী থানভী প্রকৃত সত্য কথা লিখেছেন এবং সে সাধনার কথা লিখেছেন যে সাধনার প্রক্রিয়া প্রতিটি ধর্মেই আছে। শুধু এই প্রক্রিয়া শেখাতে শেষনবী (দ:) আসেন নি। আল্লামা আযাদ সোবহানী লিখেছেন- "মোহাম্মদকে (দ:) একটি বিরাট গাছ হিসাবে নিলে তাসাওয়াফ তার একটা ডাল মাত্র।" আমিতো শারিয়াহ ও তাসাওয়াফকে মোটামুটি অর্ধেক অর্ধেক ভাগ কোরেছি, দু'টো পা বোলে, আল্লামা সোবহানী তাসাওয়াফকে একটি ডালের চেয়ে বেশি বলেন নি।

এসলামের প্রকৃত তাসাওয়াফ কি?

এসলামে তাসাওয়াফ হোচ্ছে যখনই কোন কাজ করা হবে তখন মনে রাখতে হবে এই কাজটি আল্লাহর অনুমোদিত কিনা, যদি আল্লাহ ও রসুলের অনুমোদিত হোয়ে থাকে তাহোলে সেটা করা আর যদি আল্লাহ রসুলের নিষিদ্ধ হোয়ে থাকে সেটা না করা। অর্থাৎ কাজটি করা অথবা না করা এবং সেটা হবে আল্লাহর আদেশ বা নিষেধ মোতাবেক। হুকুম দেয়ার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ কারণ সার্বভৌমত্ব হলো আল্লাহর। রসুলের কথা বলার কারণ রসুল আল্লাহর হুকুমের বাহিরে হুকুম দিতে পারেন না (সুরা হাক্কা- ৪৬, সূরা নজম ৩-৪)। আল্লাহর হুকুমের কোনটার কি মানে সেটা হলো রসুলের জীবনীতে অর্থাৎ রসুলের কথায়। সুতরাং এসলামের আধ্যাত্মিকতার শুরু হলো এখান থেকে। এটা কোরতে কোরতে কে কত উচ্চে উঠতে পারে, নিখুঁত (Perfect) হোতে পারে সেটা যার যার আমল। এটাকেই আল্লাহ বোলেছেন আমার যেকর, সকাল সন্ধ্যা তাঁর যেকর এ রত থাকা (সুরা আল আহযাব-৪১, ৪২)। অন্যভাবে বলা যায় তাকওয়া। জান্নাতে স্তর নির্ধারিত হবে এই তাকওয়া বা যেকরের উপর নির্ভর করে। বর্তমানে আধ্যাত্মিকতার নামে যে সূফিবাদ চালু

আছে সেটা আল্লাহ ও রসুলের নয়। মো'মেনদের মধ্যে যিনি আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে যত সচেতন, যত বেশি মোত্তাকি তিনি তত বড় আধ্যাত্মিক সাধক। গাছের নিচে, ঝোপ ঝাড়ে বোসে, গুহায়, খানকায় বোসে অধ্যাত্ম অর্জন শেষ এসলামের অধ্যাত্ম নয়।

আধ্যাত্মিক সাধকদের মূল উদ্দেশ্য হোচ্ছে ষড় রিপুকে দমন কোরে আত্মার উন্নতি সাধন। এখানে ষড়রিপু সম্পর্কে দুইটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। প্রথম ধরুণ 'লোভ'। লোভ হোল মানুষের ষড়রিপুর একটি রিপু। লোভ মানুষকে হীন পশুতে পরিণত করে দিতে পারে। একজন সাধক চোখ বন্ধ কোরে, না খেয়ে, আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ (Control) করতে পারে, যেমন হয়তো সে ৫০ বছরে কেবল লোভ থেকে মুক্ত হোল (যদিও আদৌ ১০০% সম্ভব কিনা তা যথেষ্ট সন্দেহ রোয়েছে)। অন্যদিকে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের ডাক যখন আসে একজন মো'মেন মোজাহেদ সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়ি, ঘর, সহায় সম্পত্তি, আত্মীয় পরিজন, বাবা-মা, স্ত্রী, সন্তান সব কিছুর মায়া ত্যাগ কোরে জেহাদের অংশগ্রহণ করে, অতঃপর সেখানে অবশেষে নিজের জানটুকু পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় কোরবান কোরে শহীদ হোয়ে যায়। তাহোলে লোভ থেকে, মোহ থেকে, ক্রোধ থেকে, ভোগের বাসনা থেকে ১০০% কে মুক্ত হোয়ে গেলো, কামেলিয়াত অর্জন কোরল, নিশ্চয় ঐ মোজাহেদ। একজন মোজাহেদ জেহাদ করে প্রথমত মানবজাতির কল্যাণের জন্য, আল্লাহকে বিজয়ী করার জন্য, পক্ষান্তরে সাধু, ফকীর, দরবেশ জুহুদ বা আত্মিক সাধনা করে একান্তই নিজের জন্য, স্বীয় আত্মিক পরিতৃপ্তি ও পরিশুদ্ধির জন্য। প্রশ্ন হোল বছরের পর বছর ধোরে যে সাধক জুহুদ কোরে অর্থাৎ সাধনা কোরে একটা একটা কোরে রিপু জয় কোরতে চেষ্টা কোরল কিন্তু কোনটা থেকেই হয়তো পুরোপুরি মুক্ত হোতে পারলো না সেখানে একজন মোজাহেদ কিভাবে সমস্ত কিছু বিসর্জন দেওয়ার মাধ্যমে একসঙ্গে সকল ষড়রিপু থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হোয়ে সর্বোচ্চ কামেলিয়াত হাসিল কোরল। এর সহজ উত্তর, এটা মহান আল্লাহ কোরে দিয়েছেন কারণ সে আল্লাহকে বিজয়ী করার জন্য আত্মনিয়োগ কোরেছে।

এখানে একটা কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই সুন্দর পৃথিবী আল্লাহ সৃষ্টি কোরেছেন বনী আদমের জন্য, বনী আদম আল্লাহর খেলাফত কোরবে, এখানে তারা শান্তিতে থাকবে, দুনিয়ার আলো বাতাস, খাদ্য পানীয় ইত্যাদি ভোগ কোরবে, বংশ বৃদ্ধি কোরবে, দুনিয়া চাষাবাদ কোরবে এটাই হলো স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ যদি কাম প্রবৃত্তি দমন কোরতে থাকে, পাহাড়ে জঙ্গলে বসে সংসার না

কোরে জীবন অতিবাহিত করে তাহোলে মানবজাতি একসময় বিলুপ্ত হোয়ে যাবে। কয়েকটি প্রশ্ন এখানে প্রাসঙ্গিক:

ক) যদি নারী পুরুষ বৈবাহিক জীবন যাপন না করে তাহোলে আল্লাহ নারীদের সৃষ্টি কোরলেন কেন?

খ) বনী আদমের বংশ বৃদ্ধি হবে কিভাবে, আল্লাহর খেলাফত কে কোরবে?

গ) সমস্ত মানবজাতির পক্ষে কি এসব তরিকা অবলম্বন করা সম্ভব? যদি সম্ভব না হয় তবে তা সার্বজনীন নয়। আর যা সার্বজনীন নয় তা এসলাম হোতে পারে না।

ঘ) তাছাড়া আল্লাহর রসুল (দ:) বোলেছেন, 'তোমাদের উপর তোমাদের নফ্সের হক রোয়েছে। নফল সওম রাখো এবং তা থেকে বিরত থাকো। রাতের বেলা তাহাজ্জুদের সালাহ কায়েম করো এবং ঘুমাও। আমি তাহাজ্জুদের সালাহ কায়েম কোরি এবং ঘুমাইও। কোন কোন সময় সওম রাখি। আবার কোন কোন সময় সওম ত্যাগও কোরি। গোশত খাই, চর্বিও খেয়ে থাকি। স্ত্রীদের নিকটও যাই। যে আমার সুন্নাহ ত্যাগ করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।' শরীরকে বঞ্চিত করাকে তিনি জুলুম বা অন্যায় বোলে আখ্যায়িত কোরেছেন।

সুতরাং এই কথা পরিষ্কার যে, এসলামের অধ্যাত্মবাদ হোল প্রত্যেক কাজে আল্লাহর উপস্থিতি গণ্য করা অর্থাৎ এটা মনে করা যে আমার এই কাজ আল্লাহ দেখছেন এবং আল্লাহর আদেশ নিষেধ অনুযায়ী সেই কাজ করা বা না করা। যে এটা যত বেশি স্মরণে রেখে জীবন অতিবাহিত কোরল সে তত বড় কামেল, তত বড় মোত্তাকী।

মহান আল্লাহ আখেরী নবী মোহাম্মদের (দ:) উপরে শেষ জীবনবিধান (দীন) হিসেবে যে জীবনব্যবস্থাটি পাঠিয়েছেন সেটা ভারসাম্যযুক্ত জীবনব্যবস্থা। কিসের ভারসাম্য? দুনিয়া ও আখেরাতের ভারসাম্য, দেহ ও আত্মার, শরীয়াত এবং মারেফতের ভারসাম্য। এজন্য আল্লাহ এই উম্মাহকে বোলেছেন, "আমি তোমাদেরকে ভারসাম্যযুক্ত জাতি হিসেবে সৃষ্টি কোরেছি (মিল্লাতান ওয়াসাতা-সুরা বাকারা ১৪৩)। যুগে যুগে যত নবী-রসুলদেরকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন প্রত্যেক নবীর উম্মাহ পরবর্তীতে দীনের ভারসাম্য নষ্ট কোরেছে। এই ভারসাম্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ আবার নবী পাঠিয়েছেন। কোন জাতি শরীয়াহর উপর বেশি গুরুত্ব দিলে, আধিক্য আরোপ

কোরলে অর্থাৎ বাড়াবাড়ি কোরলে আধ্যাত্মিকতা হারিয়ে গেছে, আবার কেউ শরীয়াহকে পূর্ণ ত্যাগ কোরে সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিকতায় মগ্ন হোয়ে গেছে। আধ্যাত্মিকতায় ডুবে যাওয়ায় দীনের ভারসাম্য নষ্ট হোয়ে গেছে। স্বভাবতঃই, দীনের ভারসাম্য নষ্ট হোয়ে গেলে সেটা আর মানুষের পালনের যোগ্য থাকে না, অনুসরণের যোগ্য থাকে না। আখেরী নবীর উপর অবতীর্ণ দীনটার ভারসাম্য যেন নষ্ট না হয় সেজন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতের, শরীয়াহ ও আধ্যাত্মিকতার একটা ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা দিয়ে দীনটাকে পাঠিয়েছেন। মহানবী (দ:) পরিশ্রম ও কঠোর

অধ্যবসায় কোরে, স্বশস্ত্র সংগ্রাম কোরে এমন একটা জাতি তৈরি কোরেছেন, যে জাতি ৬০-৭০ বছরের মধ্যে অর্ধপৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা কোরল স্বশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে, কেতালের মাধ্যমে। তাঁর উম্মাহর উপরে দায়িত্ব ছিল সমস্ত দুনিয়াতে দীন প্রতিষ্ঠার, কিন্তু এই উম্মাহ সে দায়িত্ব ভুলে, আকীদা ভুলে জেহাদ ত্যাগ কোরল। সমস্ত পৃথিবীময় আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কাজ ছেড়ে দিয়ে তাদের একদল সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কোরে সহজ-সরল দীনটাকে জটিল, দুর্বোধ্য, মাকড়সার জালের ন্যায় সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরে নিয়ে গেল। তাদের এই ব্যাখ্যা, অতি ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, তাফসির, ফেকাহর, সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিশ্লেষণের

উপর গড়ে উঠল বিভিন্ন মত, পথ, ফেরকা, মাজহাব, তরিকা ইত্যাদি। আরেকদল আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম ত্যাগ কোরে অন্তঃর্মুখী হোয়ে গেল, সেখানে আধ্যাত্মিক সাধনা কোরে রিপুজয়ী, সাধু-সন্ন্যাসী হওয়ার চেষ্টা কোরল। একদল দীনের সহজ-সরলতাকে জটিল দুর্বোধ্য কোরে জাতিকে খণ্ড-বিখণ্ড কোরে দিল। আরেক দল দীনের বহির্মুখী, সংগ্রামী, জেহাদী চরিত্রকে অন্তঃর্মুখী, ঘরমুখী কোরে ফেলল। দুই দলই দীনের ভারসাম্য নষ্ট কোরে ফেললো। আজকে দুনিয়াময় আধ্যাত্মিকতাবাদের নামে যা চোলছে, সুফিজমের নামে যা চোলছে তা ভারসাম্যহীন সুফিবাদেরই নামান্তর।

তাসাওয়াফের প্রক্রিয়ায় সাধনা কোরে আত্মার উন্নতি কোরে আল্লাহর নৈকট্য লাভ যে এই দীনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয় তার চূড়ান্ত প্রমাণ এই হাদিসটি- হিজরতের আগে, যখন মোশরেকদের অমানুষিক অত্যাচার, নির্যাতন মুষ্ঠিমেয় মোসলেমদের অসহ্য হোয়ে উঠেছে অথচ তারা অসহায়, কিছু করার নেই, তখন একদিন এক সাহাবা বিশ্বনবীকে (দ:) বোললেন- হে আল্লাহর রসুল! আপনি দোয়া কোরুন যাতে এই মোশরেকরা ধ্বংস হোয়ে যায়। এটা ইতিহাস যে মানব জাতির মুকুটমনি (দ:) জীবনে খুব কমই রাগান্বিত হোয়েছেন। সেদিন ঐ সাহাবার কথা শুনে তিনি রেগে গিয়েছিলেন এবং বোলেছিলেন- শীগগীরই এমন সময় আসছে যখন একটি মেয়ে লোক একা সানা থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ কোরতে পারবে, তার মনে এক আল্লাহ এবং বন্য পশু ছাড়া আর কিছুরই ভয় করার থাকবে না (হাদীস- খাব্বাব (রা:) থেকে- বোখারী, মেশকাত)। বিশ্বনবীর (দ:) কথাটার ভেতরে প্রবেশ কোরুন। তিনি কি বোললেন? তিনি ইংগিত দিলেন, এত বাধা, এত অত্যাচার সত্বেও তিনি সফল হবেন এবং যাদের ধ্বংস করার জন্য ঐ সাহাবা দোয়া কোরতে বোলছেন তারাই এমন বদলে যাবে এবং তাদের দিয়েই এমন একটি রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে একা একটা মেয়ে মানুষ কয়েক শ'মাইল পথ নির্ভয়ে চলে যেতে পারবে। রসুলাল্লাহ (দ:) তাঁর সাহাবাকে যে উত্তরটি দিলেন তা দিয়ে শুধু একটি মাত্র কথা বোঝায় আর তা হলো এই যে, তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হোচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা যেখানে ন্যায়-বিচার, আইন-শৃঙ্খলা ও জনসাধারণের নিরাপত্তা এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, একা একটি মেয়ে মানুষও ঐ দূরত্বের পথে চোলতে কোন ভয়ই কোরবে না। তিনি ঐ সাহাবার জবাবে এ কথা বোললেন না যে, এমন সময় আসছে যখন এই সব মোশরেক ও কাফেররা দলে দলে মসজিদে যেয়ে নামাজ পড়বে, রোযা রাখবে, হজ্ব কোরবে, যাকাত দেবে, দাঁড়ি রাখবে, টুপি পরবে, চিল্লায়, খানকায় বোসে মোরাকাবা কোরবে, যিকর কোরবে। তাঁর কথার একমাত্র

অর্থ হোচ্ছে, এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা যেখানে অন্যায়, অবিচার অর্থাৎ অশান্তি থাকবে না ও এমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব শুধুমাত্র আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা মানুষের সার্বিক জীবনে প্রতিষ্ঠা হোলে, এবং তাই ছিলো বিশ্বনবীর (দ:) জীবনের উদ্দেশ্য। এবং ঐ উদ্দেশ্য পূরণ ফিকাহর বিশ্লেষণ কোরেও হবে না, খানকায় বোসে রেয়াযাত কোরেও পাওয়া যাবে না। শুধু পাওয়া যাবে না নয়, ফিকাহর বিশ্লেষণ ও খানকায় তসবিহ টপকানো বিশ্বনবীর (দ:) জীবনের উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ কোরে দেবে, এবং দেবে নয়- দিয়েছে। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ কোরতে পারে শুধুমাত্র দীনুল কাইয়্যেমাকে, সেরাতুল মোস্তাকীমকে আঁকড়ে ধোরে রেখে তওহীদের উপর ঐক্যবদ্ধ হোয়ে সংগ্রাম কোরে যাওয়ার পথে। রসুলাল্লাহ (দ:) সেদিন ঐ সাহাবার কথার উত্তরে যে ভবিষ্যত বাণী কোরেছিলেন তা কিছুদিনের মধ্যেই সত্যে পরিণত হোয়েছিলো এটা ইতিহাস। এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিলো যে রাষ্ট্রে অন্যায় অবিচার লুপ্ত হোয়ে গিয়েছিলো, সম্পত্তি ও জীবনের নিরাপত্তা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে সত্যই একজন মেয়ে মানুষ আরবের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত নির্ভয়ে ভ্রমণ কোরতে পারতো। মানুষ রাতে শোওয়ার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব কোরত না, রাস্তায় ধনসম্পদ হারিয়ে ফেললেও তা পরে যেয়ে যথাস্থানে পাওয়া যেত, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, রাহাজানী প্রায় নির্মূল হোয়ে গিয়েছিল, আদালতে মাসের পর মাস কোন অপরাধ সংক্রান্ত মামলা আসতো না। আর অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিটি মানুষ স্বচ্ছল হোয়ে গিয়েছিল। এই স্বচ্ছলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মানুষ যাকাত ও সদকা দেওয়ার জন্য টাকা পয়সা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো কিন্তু সেই টাকা গ্রহণ করার মত লোক পাওয়া যেত না। শহরে নগরে লোক না পেয়ে মানুষ মরুভূমির অভ্যন্তরে যাকাত দেওয়ার জন্য ঘুরে বেড়াতো। কিন্তু বিশ্বনবীর (দ:) প্রতিষ্ঠিত ঐ রাষ্ট্র ফকিহ ও মুফাসসিরদের অতি বিশ্লেষণ দিয়েও হয় নি, আধ্যাত্মিক সাধকদের খানকায় বোসে মোরাকেবা দিয়েও হয় নি, হোয়েছে বিশ্বনবীর (দ:) ও তাঁর আসহাব মুজাহিদদের (রা:) অবিশ্রান্ত সশস্ত্র সংগ্রামের ফলে। এটা ইতিহাস এবং এটাও ইতিহাস যে আমাদের ফকিহ ও সুফীদের জন্ম হোয়েছে বহু পরে। মহানবী (দ:) ও তাঁর আসহাবদের কেউই হুজরায় বা খানকায় বসেন নি। বাড়িঘর, সহায় সম্বল বিসর্জন দিয়ে নিজের জীবন বিসর্জনকারী সাহাবীদের সংগ্রামের বিনিময়ে অর্ধ-পৃথিবীতে এমন একটি সমৃদ্ধ, উন্নত এবং সম্মানিত জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিলেন যারা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে, সর্বদিকে পৃথিবীর শিক্ষকের আসন অধিকার কোরেছিল। দুনিয়ার কোন শক্তি ছিল না এই জাতির দিকে

চোখ তুলে তাকায়। কিন্তু পরে যখন এই উম্মাহ সংগ্রাম ত্যাগ কোরে খানকায় আস্তানায় ঢুকে রিপুজয়ী সুফী সাধক পীর দরবেশ হোল তখন এরা সংখ্যায় কোটি কোটি। এই অবস্থাতে তারা খ্রিস্টান জাতিগুলির গোলামে পরিণত হোল। তাহোলে কী লাভ হোল এতবড় মোহাদ্দেস, মোফাসসের, মুফতি, দরবেশ, আউলিয়া, আধ্যাত্মিক সাধক হোয়ে? মহানবীর লেখাপড়া না জানা প্রায় নিরক্ষর একটি জাতি অর্ধ দুনিয়া দখল কোরে আল্লাহ-রসুলের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম কোরল আর পণ্ডিত সুফী দরবেশে ভরপুর কোটি কোটি জনসংখ্যার বিরাট জাতি খ্রিস্টানদের ক্রীতদাসে পরিণত হোল।

জেহাদে আকবর নিয়ে অপপ্রচার

কিন্তু যেহেতু সুফীরা মানব জীবনের একটি দিককে আকড়ে ধোরলেন সুতরাং তারা ভারসাম্যহীন হোয়ে গেলেন। যে ভারসাম্যের উপর আল্লাহ এই শেষ এসলামকে প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন সেই ভারসাম্য, সেরাতুল মোস্তাকীম সুফীরা নষ্ট কোরে দিয়ে এক পাশে, আত্মার পাশে ঝুঁকে পড়লেন। দীন এক পা ওয়ালা মানুষের মত চলার শক্তি হারিয়ে ফেললো। নিজেদের কাজকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য তারা যুক্তি দেখালেন- আমরা তো জেহাদ ছাড়ি নি। আমরা জেহাদে আকবর কোরছি, কারণ নফসের সঙ্গে জেহাদ হোচ্ছে জেহাদে আকবর বড় জেহাদ। এই কথাটিকে তারা একটি হাদীস হিসাবে চালিয়ে দিলেন কিন্তু এই হাদীসের সংকলক এমাম বায়হাকি নিজেই স্বীকার কোরেছেন যে, এই হাদীসের সনদ ত্রুটিযুক্ত এবং এই দয়িফ হাদীস সম্বন্ধে হাফেয ইবনে হাজ্জার প্রমুখ মোহাদ্দেসরা বোলেছেন, এটা কোন হাদীসই না, এটা একটা আরবী প্রবাদ বাক্য মাত্র। তার চেয়েও বড় কথা হোচ্ছে কোন হাদীস সহীহ্ কি না তা যাচাই করার প্রথম কষ্ঠিপাথর হোচ্ছে কোর'আন। সেই কোর'আনেই আল্লাহ স্বয়ং আমাদের বোলে দিচ্ছেন বড় জেহাদ অর্থাৎ জেহাদে আকবর বা কবীর কোন্টা। সুরা ফোরকানের ৫২ নং আয়াতে তিনি বোলেছেন, ''সুতরাং কাফেরদের কথামত চলো না এবং এর (কোর'আনের) সাহায্যে তাদের সঙ্গে বড় জেহাদ কর। জেহাদান কবীর কর।'' অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদই হোচ্ছে জেহাদে আকবর, নফসের সঙ্গে নয়। সুতরাং আল্লাহর রসুলের (দ:) সুন্নত থেকে কাপুরুষের মত পলায়নের লক্ষ্যে তারা যে ভুল হাদীসের উল্লেখ কোরে থাকেন

"নিশ্চয়ই নিজের মনের বিরুদ্ধে জেহাদ করাই শ্রেষ্ঠ জেহাদ" - আল কোর'আন। এই কথাটি বিভিন্ন স্কুল কলেজের দেয়ালে কোর'আন বা হাদীসের বরাত দিয়ে লেখা হয়। দুঃখজনক বিষয় হোল কথাটি কোর'আনে নেই, কোন সহীহ হাদীসেও নেই।

তা সরাসরি কোর'আনের বিরোধিতা। আল্লাহ যে জন্য জেহাদ কোরতে আদেশ কোরছেন তা হলো যে জন্য তিনি তার রসুল পাঠিয়েছেন- অর্থাৎ পৃথিবীময় আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থা, এসলাম প্রতিষ্ঠা করা। এই জেহাদ যারা কোরবে তাদের নিজেদের চরিত্র গঠন কোরতে গেলে তাদের ভেতরের শয়তানের বিরুদ্ধেও তাদের জেহাদ কোরতে হবে। তাই বাইরের জেহাদ হবে প্রচার কোরে, মানুষকে যুক্তির মাধ্যমে বুঝিয়ে, বক্তৃতা কোরে, লিখে এবং অস্ত্র নিয়ে। ভেতরের জেহাদ হবে শয়তানের প্ররোচনার বিরুদ্ধে, লোভ, অহংকার, হিংসা, ইর্ষা, ক্রোধ ও কামের বিরুদ্ধে। এই দু'রকম জেহাদের যে কোনটাকে বাদ দিলেই সেই ভারসাম্য নষ্ট হোয়ে যাবে এবং সেই এক পা ওয়ালা মানুষের মত জাতিও চলার শক্তি হারিয়ে স্থবির হোয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, যে উদ্দেশ্যে ভেতরের জেহাদ সেই উদ্দেশ্যই অপূর্ণ থেকে যাবে। একটি মানুষ হোক আর একটি জাতিই হোক,

গতিই (Dynamism) প্রাণ; যারই গতি রুদ্ধ হোয়ে গেলো সেটাই মৃত। সুফীদের কাজের ফলে এই জাতি এক পা হারিয়ে স্থবির, গতিহীন অর্থাৎ মৃত হোয়ে গেলো। যে জন্য বিশ্বনবী (দ:) বোলেছিলেন আমার জাতির আয়ু ৬০/৭০ বছর।

কিন্তু এইই সব নয়। অতি বিশ্লেষণকারী পণ্ডিতদের এবং এই সুফীদের কাজের সম্মিলিত একটি ফল হলো: যা ভয়ংকর, যা এই জাতিটিকে, এই উম্মাহকে একেবারে বিপরীতমুখী কোরে দিয়েছে। তা হলো এই যে, এই জাতিকে অন্তর্মুখী কোরে দিয়েছে। আমি পেছনে বোলে এসেছি যে, বিশ্বনবী (দ:) যে জাতিটি সৃষ্টি কোরলেন সেটার মূল চরিত্র হলো শুধু বহির্মুখী নয় একেবারে বিস্ফোরণমুখী (Explosive)। এই জাতির ইতিহাস দেখুন। শত্রু মিত্র কেউই এ ইতিহাস সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণ করে না যে, বিশ্বনবীর (দ:) নেতৃত্বে এই জাতি একটি বোমের মত ফেটেছিলো এবং তেইশ বছরে সমস্ত আরব উপদ্বীপকে আচ্ছন্ন কোরে ফেলেছিলো। তারপর বিশ্বনবীর (দ:) ওফাতের পর তাঁর অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্তির পথে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রামে, জেহাদে, এই উম্মাহ আরেকবার বিস্ফোরিত হলো মহা শক্তিশালী এটম বোমের মত এবং এক বিস্ফোরণে মাত্র ৬০/৭০ বছরের মধ্যে আটলান্টিকের তীর থেকে ভারত মহাসাগরের তীর পর্যন্ত আচ্ছন্ন কোরে ফেললো। এরপর আর কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে যে, এই জাতির উম্মাহর মূল চরিত্র হোচ্ছে জেহাদ এবং বিস্ফোরণমুখী (Explosive)? এবং ঐ চরিত্র সৃষ্টি কোরেছিলেন স্বয়ং আল্লাহর রসুল। এই বর্হিমুখী (Extrovert) এবং বিস্ফোরণমুখী (Explosive) চরিত্র তিনি (দ:) সৃষ্টি কোরেছিলেন অবশ্যই স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশেই, এতে তো আর সন্দেহের কারণ থাকতে পারে না। আজ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মানবজাতির সকল সুখ শান্তি হরণকারী মহা প্রতারক দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদী খ্রিস্টান 'সভ্যতা'র অনুসারীরা সেই প্রচণ্ড গতিশীল, সমৃদ্ধ এসলামকে আফিম, কুপমণ্ডুক, পশ্চাদপদ বোলে গালি দেয় কিন্তু তারা যে এসলামটা দেখছে সেটা আসলে তাদেরই তৈরি অন্যান্য ধর্মের মত একটি ধর্ম মাত্র, এটা আল্লাহ রসুলের এসলামই নয়।

সাধারণ জ্ঞানেও বোঝা যায় যে, যে নবীর (দ:) উপর আল্লাহ দায়িত্ব দিলেন এই শেষ জীবন ব্যবস্থাকে, এই শেষ সংবিধানকে সমস্ত মানব জাতির উপর প্রতিষ্ঠা করার এবং যে দায়িত্ব নবীর পর তাঁর উম্মাহর উপর বর্তালো সে উম্মাহর চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গী, আকীদা অবশ্যই বহির্মুখী হোতে হবে, নইলে ঐ কাজের একবিন্দু অগ্রগতি হবে না। কোনভাবে যদি এই জাতিকে তার চরিত্র বদলিয়ে

অন্তর্মুখী করা যায় তবে ঐ জাতি শেষ হোয়ে গেলো। এ সম্বন্ধে এখানে একটা হাদীস পেশ কোরছি। একবার মহানবী (দ:) সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে জেহাদে যাচ্ছিলেন। পথে এমন একটা স্থানে বিশ্রামের জন্য যাত্রা বিরতি কোরলেন যে জায়গাটা নির্জন, ছায়া ঘেরা এবং একটি পানির ঝরণা আছে। একজন সাহাবা বোললেন- আহ্! আমি যদি এই সুন্দর নির্জন জায়গাটায় একা থেকে যেতে পারতাম। অবশ্যই তিনি ওখানে থেকে আল্লাহর এবাদতের কথা বোঝালেন, কারণ এ নির্জনে বোসে তো আর ঘর-সংসার বা ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বোঝান নি। আল্লাহর রসুল (দ:) ঐ কথা শুনে বোললেন- আমি ইহুদী বা খ্রিস্টান ধর্ম নিয়ে আসিনি, আমাদের এ পথ নয়। যার হাতে মোহাম্মদের জীবন তার কসম, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য শুধু সকাল বা বিকাল বেলার (একবেলা) পথ চলা সমস্ত পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার চেয়ে এবং ৬০ বছরের নামাযের চেয়ে বেশি (হাদীস- আবু ওমামা (রা:) থেকে -আহমদ, মেশকাত)। তাঁর কথার অর্থ হলো পূর্ববর্তী নবীরা তাদের যার যার জাতিও সমাজের মধ্যে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা কোরতে প্রেরিত হোয়েছিলেন। তাদের স্থান ও পরিধি ছিলো সীমিত, ছোট। কিন্তু শেষ নবী (দ:) প্রেরিত হোয়েছেন বিশাল পৃথিবীতে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত কোরতে, তাঁর নিজের এবং তাঁর উম্মাহর কোন অবকাশ, কোন উপায়ই নেই তাদের নিজেদের কোথাও সীমিত, অবরুদ্ধ কোরে ফেলতে। তাদের কার্যক্ষেত্র এই বিশাল পৃথিবী এবং সংগ্রাম অন্য নবীদের এবং তাদের উম্মাহর তুলনায় বহু গুণ বৃহত্তর ও কঠিন। তাই এই শেষ উম্মাহকে কোথাও কোন বন্ধনে সীমিত কোরলে তা হবে এই উম্মাহকে হত্যা কোরে ফেলার মত। তাই বিশ্বনবী (দ:) তাঁর সাহাবার কথা শুনে তার প্রতিবাদ কোরে তার দৃষ্টিভঙ্গীর, আকীদার সংশোধন কোরে দিলেন। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ এই জাতির জন্য জেহাদ ত্যাগ করাকে স্থায়ীভাবে হারাম কোরে দিয়েছেন, জেহাদ থেকে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন কোরবে তাদের জন্য অবধারিত কোরেছেন তাঁর গজব, ক্রোধ এবং জাহান্নাম (সুরা আনফাল ১৬)। এবং এই জাতি যেন কোথাও থামতেও না পারে সেজন্য আল্লাহ কাফেরদের প্রতি সন্ধির প্রস্তাব করাকেও নিষেধ কোরে দিয়েছেন (সুরা মোহাম্মদ ৩৫)। এখানে প্রসঙ্গতঃ একটা বিষয় উল্লেখ করা যায়। তা হোল জেহাদে অবতীর্ণ হোলে কোনভাবেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা যাবে না (সুরা আনফাল ১৫-১৬), এমনকি সন্ধির প্রস্তাবও করা যাবে না (সুরা মোহাম্মদ ৩৫)। সন্ধির প্রস্তাবের অর্থ হোল বোসে যাওয়া।

কাজেই যে উম্মাহ এত দুর্জয় গাতিশীল হবে, সে উম্মাহ কী কোরে খানকায় ঢুকে অন্তর্মুখী সুফী দরবেশে পরিণত হয়?

যে জাতির উপর আল্লাহর এই আদেশ সেই জাতির উদ্দেশ্য যে কত সুদূরপ্রসারী তা অনুধাবন না কোরে এবং আল্লাহ ও রসুলের অলংঘনীয় সাবধানবাণীগুলিকে অগ্রাহ্য কোরে মহা পণ্ডিতরা, মোফাসসের, মোহাদ্দেস, ফকিহ, মুফাসসিররা দীনের চুলচেরা বিশ্লেষণ কোরে এ জাতিকে তো আগেই দীনুল-কাইয়্যেমা, সেরাতুল মোস্তাকীম, সহজ-সরল দীন থেকে বিচ্যুত কোরে, বহু মযহাব ও ফেরকায় বিভক্ত কোরে এর ঐক্য ও শক্তি ভেঙ্গেচুরে দিয়েছিলেন, এবার সুফীরা এসে এর দিকনির্দেশনাই একেবারে উল্টো দিকে কোরে দিলেন। যে উম্মাহকে আল্লাহর রসুল (দ:) হাতে তলোয়ার ধরিয়ে দিয়ে ঘর থেকে পৃথিবীতে বের কোরে দিয়েছিলেন সুফীরা সে উম্মাহর হাত থেকে তলোয়ার কেড়ে নিয়ে হাতে তসবিহ ধরিয়ে দিয়ে পেছন টেনে ঘরে, খানকায় বসিয়ে দিলেন। লক্ষ শত্রু বিশ্বনবীর (দ:) জীবনের ব্রতকে যে ক্ষতি কোরতে পারে নি, পণ্ডিত ও ভারাসাম্যহীন সুফীরা তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ক্ষতি কোরলেন। মহানবী (দ:) তাঁর উম্মাহকে যেদিকে চালনা কোরলেন সুফীরা চালনা করলেন তার উল্টো দিকে। মহানবী (দ:) চালনা কোরে ছিলেন বাইরের দিকে সুফীরা, দরবেশরা চালনা কোরলেন ভেতরের দিকে। রসুলাল্লাহ (দ:) এ জাতিকে চালনা কোরেছিলেন অন্যায়ের, অবিচারের আর অশান্তির সঙ্গে সংঘর্ষের দিকে, এরা চালনা কোরলেন অন্যায়ের (যুলম) কাছে আত্মসমর্পণের দিকে, পালানোর দিক। এই জাতির পণ্ডিতদের আলেমদের কাজের ফলে জাতি ঐক্যহীন, খণ্ড-বিখণ্ড একটি শক্তিহীন পদার্থে পরিণত হলো, তারপর সুফীরা এসে একে এর চলার দিক পরিবর্তন কোরে উল্টো দিকে পরিচালিত কোরলেন। এর পর এ জাতির আর রইলো কি? কিছুই না। এই কথাই বিশ্বনবী (দ:) বলেছেন- আমার উম্মাহর আয়ু ৬০ থেকে ৭০ বছর। ইতিহাস দেখুন, যখন রসুল (দ:) ঐ কথা বোলেছিলেন তার মোটামুটি ৬০/৭০ বছর পরই এই উম্মাহ পৃথিবীতে এই দীন প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রাম জাতি হিসাবে ছেড়ে দেয়। ঐ সময়েই জাতি হিসাবে উম্মতে মোহাম্মদীর মৃত্যু হয়, মহানবীর (দ:) ভবিষ্যতবাণী সঠিক হয়।

এইখানে মনে আসে রসুলাল্লাহর (দ:) আরেকটি হাদীস। একদিন তিনি সাহাবাদের সামনে একটি সোজা লাইন টানলেন (বোধহয় মাটির উপর), তারপর বোললেন- এই হোচ্ছে আল্লাহর রাস্তা সেরাতুল মোস্তাকীম। এরপর তিনি ঐ সোজা লাইন থেকে ডানদিকে কতকগুলি ও বাঁ দিকে

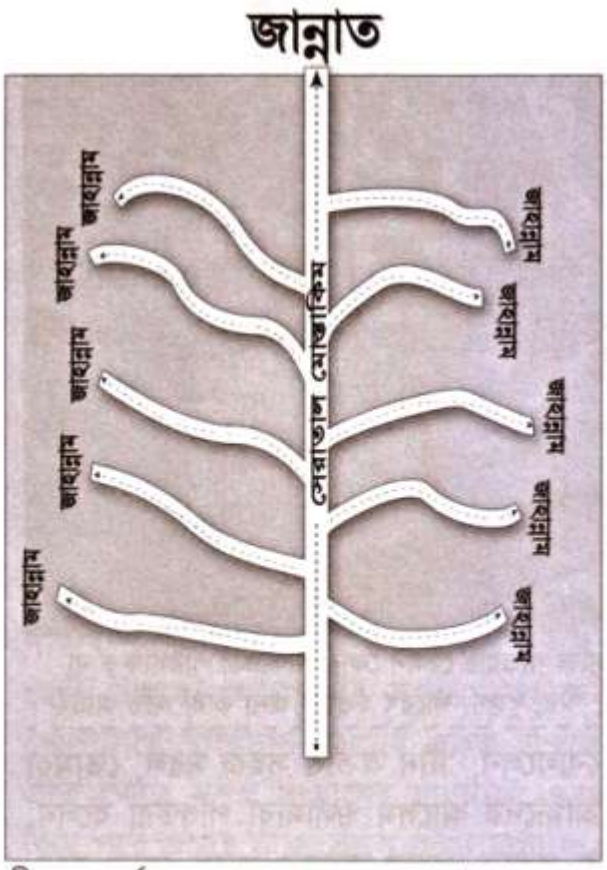

জীবনের সর্বাঙ্গনে আল্লাহর হুকুমকে প্রত্যাখ্যান কোরে মানুষের হুকুম মেনে নিয়ে মানবজাতি আজ বক্রপথে চোলছে। তাদের নিশ্চিত গন্তব্য জাহান্নাম।

কতকগুলি লাইন রেখা টেনে বোললেন- এইগুলি ঐ রাস্তা যে রাস্তায় যাবার জন্য শয়তান ডাকতে থাকবে। এই বোলে তিনি (দ:) কোর'আন থেকে পড়লেন- নিশ্চয়ই এই হোচ্ছে আমার সহজ, সরল পথ (সেরাতুল মোস্তাকীম)। এই পথে চল, অন্যান্য পথে চলো না। কারণ ঐ সব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর ঐ পথ থেকে বিচ্যুত কোরে দেবে (হাদীস- আব্দাল্লাহ বিন মাসুদ (রা:) থেকে আহমদ, নিসায়ী, মেশকাত)। আল্লাহর রসুলের (দ:) এ উপদেশ ও সতর্কবাণীকে আমাদের মহাপণ্ডিতরা আর সুফী দরবেশরা উপেক্ষা কোরেই ঐ সেরাতুল মোস্তাকীম থেকে জাতিকে দুই দিকে টেনে নিলেন। তারা দেখলেন না আল্লাহ কতবার তাঁর কোর'আনে এই সেরাতুল মোস্তাকীমকে, দীনুল কাইয়্যেমাকে উল্লেখ কোরেছেন এবং কোন জটিলতায় না যেয়ে এই সহজ সরল রাস্তায় আমাদের রাখার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনাকে বাধ্যতামূলক কোরে দিয়েছেন, শুধু প্রতি ওয়াক্তে নয় একেবারে প্রতি রাকাতে। এই সেরাতুল মোস্তাকীম, সহজ সরলতাকে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা কোরলে আল্লাহ একে প্রতি রাকাতে পড়া ফরজ কোরে দিতে পারেন। আর সত্যই এই সরলতা এতই গুরুত্বপূর্ণ এত প্রয়োজনীয়। আল্লাহ এই দীনের পথকে বোললেন সেরাতুল মোস্তাকীম বা সহজ সরল পথ, আর মহানবী বোললেন, 'দীন অত্যন্ত সহজ সরল, তোমরা একে জটিল কোর না।' আর আমাদের আলেম ওলামারা পণ্ডিতরা বলেন, দীন বোঝা অত্যন্ত কঠিন, একে বুঝতে হোলে তাদের কাছে যেতে হবে, মাদ্রাসায় পড়তে, হবে, ডিগ্রী নিতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ ও রসুলের ঠিক বিপরীত কথা।

বর্তমানের গোলামী থেকে জাতির মুক্তি পাওয়ার তেমন কোন আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত না হোলেও আলেম, মুফতি, মোফাসসের, পীর, বুজুর্গ, শায়েখ হওয়ার জন্য তারা অতি আগ্রহী।

এই সহজ সরলতাকে, সেরাতুল মোস্তাকীমকে পণ্ডিতরা এবং সুফীরা ত্যাগ কোরে জটিলতার পথ ধরার ফলে বিশ্বনবীর (দ:) উম্মাহ একটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন অন্তমুর্খী স্থবির জাতিতে পরিণত হলো। তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের সংগ্রাম করার শক্তি আর তাদের অবশিষ্ট রোইলো না।

এখানে প্রশ্ন আসে এখানেই কি তবে এই উম্মাহর শেষ? না তা নয়। মহানবীর (দ:) ভবিষ্যতবাণী মোতাবেক তাঁর উম্মাহর ৬০/৭০ বছর পর মৃত্যু ঠিকই তবে সে মৃত্যু জাতি হিসাবে। ব্যক্তিগত ও ছোট দল হিসাবে অনেক লোক সেরাতুল মোস্তাকীম, দীনুল কাইয়্যেমাকে এবং এই জাতির প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে গেলেন না। কিন্তু তারা অনেকটা অসহায় হোয়ে পড়লেন এই জন্য যে, বৃহত্তর জাতি ও সরকারী শক্তি জাতির উদ্দেশ্য ভুলে গেছে। এই ছোট ছোট দলগুলি সম্বন্ধেই শেষনবী (দ:) বোলে গেছেন- আমার উম্মাহর মধ্যে চিরদিন একদল লোক থাকবে যারা সর্বদা আল্লাহর হুকুম ইত্যাদিকে বলবৎ রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে (হাদীস- মুয়াবিয়া (রা:) থেকে বোখারী ও মোসলেম)। বৃহত্তর উম্মাহ জাতি হিসাবে উম্মতে মোহাম্মদী রইলো না কিন্তু এরা দলগতভাবে ও ব্যক্তিগত ভাবে মহানবীর (দ:) প্রকৃত অনুসারী রোইলেন। আটলান্টিকের তীর থেকে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত শেষ

জীবন ব্যবস্থা বিস্তারের পর যখন উদ্দেশ্য নষ্ট ও আকীদা বিকৃতির জন্য এর গতি রুদ্ধ হোয়ে গেল, তারপর এর যে বিস্তারটুকু হোয়েছে তা হোয়েছে ঐ দলগত উম্মতে মোহাম্মদীদের দিয়ে। যখন এরা দেখলেন যে, জাতি তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হোয়ে গেছে, এর নেতারা এখন রাজত্ব করাকেই উদ্দেশ্য মনে কোরছে, এর পণ্ডিতরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করা নিয়ে অতি ব্যস্ত হোয়ে পড়েছেন এর সুফীরা খানকায় বোসে আল্লাহকে অত্যন্ত যিকর কোরছেন কিন্তু মোহাম্মদ (দ:) এর উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্বকে সম্মুখে নিয়ে যাবার কেউ নেই তখন তারা আল্লাহর নাম নিয়ে ছোট ছোট দলেই বের হোয়ে পড়লেন পৃথিবীতে শেষ জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা কোরে শান্তি স্থাপন করার জেহাদে। **পরবর্তীতে এসলামের যে বিস্তার আফ্রিকায়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এবং চীনের মুল ভূখণ্ডে হোয়েছে তা হোয়েছে ঐ ছোট ছোট উম্মতে মোহাম্মদীর দলের জেহাদের কারণে।** বিশ্বনবী (দ:) ও খোলাফায়ে রাশেদার সময়ের প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর মতই এরা প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই এসলামের প্রসার কার্যকরী করেন। কিন্তু পরে এদের সুফী বোলে প্রচার চালানো হয় এবং এসলামের প্রকৃত রূপ দৃষ্টি থেকে বিলুপ্ত হওয়ায় ঐ প্রচারের ফলে এই জাতি ঐ দুঃসাহসী যোদ্ধাদের সুফী বলেই গ্রহণ কোরে নেয়, এবং আজও তাদের খানকাবাসী সুফী বোলেই বিশ্বাস করে। মহানবীর আবির্ভাব হোয়েছে সংগ্রাম কোরে সত্যদীন সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরে মানবজীবন থেকে অন্যায় অবিচার অশান্তি দূর কোরে শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠা করা। কাজেই উম্মতে মোহাম্মদীর অর্থই হোল প্রচণ্ড গতিশীল, বিস্ফোরণমুখী, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা একটি জাতি। উম্মতে মোহাম্মদী কখনও স্থবির, অন্তর্মুখী (Introvert), নির্জীব, নি®প্রাণ সাধু-সন্ন্যাসী হোতে পারে না। মহানবীর (দ:) সাক্ষাৎ সাহাবীরা তাই প্রত্যেকে ছিলেন আল্লাহর রাস্তায় প্রাণবিসর্জনকারী দুর্জয় মোজাহেদ। তারা কেউই মৃত্যুভয়ে ভীত, কাপুরুষ, খানকাবাসী সুফী দরবেশ ছিলেন না।

জাতিগতভাবে জেহাদ ত্যাগ করার পর যারা প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর আদর্শকে বুকে ধারণ কোরে আল্লাহর নাম নিয়ে ছোট ছোট দল নিয়ে বের হোয়ে পড়েছিলেন, তাদের জীবনী লেখকরা বহু সত্য, আধা সত্য, আধা মিথ্যা ঘটনা তাদের জীবনীগুলোতে ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের মহাসুফী বোলে চিত্রিত কোরতে চেষ্টা কোরেছেন এবং সফলও হোয়েছেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে তাদের প্রায় প্রত্যেকজনই ছিলেন মরদে মুজাহিদ। প্রত্যেকে সশস্ত্র সংগ্রাম কোরে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এই শেষ জীবন ব্যবস্থার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কোরেছেন। খুব কম স্থানেই সশস্ত্র

সংগ্রাম ছাড়া এই দীন কায়েম হোতে পেরেছে। জাতি হিসাবে উদ্দেশ্য ভুলে যাবার পর সংগ্রাম ছেড়ে দেয়ার পর ব্যক্তিগত ও দলগত ভাবে যারা উম্মতে মোহাম্মদী রইলেন তাদেরই কোরবানী ও সশস্ত্র সংগ্রামের ফলে পরবর্তীতে এই দীন পৃথিবীতে আরও বি¯তৃত হোয়েছে। এরা তখন দুনিয়া ত্যাগ কোরে এসলামের সন্ন্যাস গ্রহণ কোরে ঘরবাড়ী সম্পত্তি সব কিছু ছেড়ে দলবেঁধে সশস্ত্র সংগ্রামে বের হোয়ে না পড়লে আজ এসলাম ঐ প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যে এবং উত্তর আফ্রিকাতেই সীমাবদ্ধ থাকতো, দক্ষিণ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও চীনে বিস্তার লাভ কোরত না। বিশ্বনবীর (দ:) সময়ের প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর মত এরাও ছিলেন প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী অর্থাৎ দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। অথচ এদের প্রকৃত রং বদলিয়ে এদের সুফী বোলে চিত্রিত করা হোয়েছে নিজেদের সঠিক বোলে প্রমাণ করার জন্য। আজ তাদের কবরকে মাজারের রূপ দিয়ে চলে ওরস আর সিন্নির ছড়াছড়ি। আসলে এরা ছিলেন সুফীদের ঠিক উলটো। তারা নিজেদের সব কিছু ছেড়ে এই দীনুল কাইয়্যেমাকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জেহাদে অজানা পৃথিবীতে বের হোয়ে পড়েছিলেন, আর সুফীদের কাজ হোচ্ছে তসবিহ হাতে খানকায় বোসে তপস্যা করা।

অর্ধেক পৃথিবীতে শেষ জীবন ব্যবস্থা, শেষ এসলাম যে প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিলো তা মুজাহিদদের শাহাদাতের বিনিময়ে নয়, সুফীদের প্রচারের ফলে- এ মিথ্যা ও অবিশ্রান্ত প্রচারের ফলে মানুষের মধ্যে সত্য বোলে গৃহীত হোয়ে গেছে। এই কথা প্রমাণ করার জন্য বহু বই লেখা হোয়ে গেছে বিভিন্ন ভাষায়। যারা ঐ সব বই লিখেছেন আর যারা তা পড়ে বিশ্বাস কোরেছেন, উভয়ই প্রকৃত এসলামের আকীদা থেকে বহু দূরে। এই দীনের যে মর্মবাণী জেহাদ, কেতাল, এ সত্যকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা আরম্ভ হোয়েছে রসুলাল্লাহর (দ:) সময়ের ৬০/৭০ বছর পর থেকেই। ঐ মহাপাপের শাস্তি হিসাবে প্রথমে এসেছে অনৈক্য, তারপর নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ, রক্তারক্তি, তারপর এসেছে ইউরোপের খ্রিস্টান জাতিগুলির ঘৃণ্য গোলামী, দাসত্ব এবং স্পেন থেকে একেবারে দৈহিকভাবে নির্মূল হোয়ে যাওয়া। ঐ ধামাচাপার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হওয়ার ফলেই এসলামের পৃথিবীময় বিস্তারকে মুজাহিদদের সশস্ত্র সংগ্রামের ফলের বদলে সুফীদের প্রচারের ফল হিসাবে যেমন লেখাও হোয়েছে তেমনি তা বিশ্বাসও করা হোয়েছে এবং এখন এই মিথ্যা সর্বত্র গৃহীত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখতে গেলে আলাদা বই-ই হোয়ে যাবে, কাজেই শুধু কয়েকটি বুনিয়াদী সত্য লেখা ছাড়া উপায় নেই।

সমস্ত পৃথিবীর খবর আমার জানা নেই, কাজেই পৃথিবীর যে অংশে আমি বাস করি শুধু সেইটুকুর কথাই বোলছি। এই দেশে শেষ এসলাম প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে বখতিয়ার খিলজীর তলোয়ারের শক্তিতে। উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশে হোয়েছে শাহজালালের (রা:) তলোয়ারে, যে তলোয়ার আজ উপেক্ষিত হোয়ে পড়ে আছে। দক্ষিণ বাংলায় হোয়েছে খান জাহান আলীর (রা:) তলোয়ারে। উত্তর বাংলায় হোয়েছে সুলতান মাহমুদ মাহী সওয়ারের (রা:) তলোয়ারের শক্তিতে, পশ্চিম বাংলায় হোয়েছে শাহ সফী উদ্দিন (রা:), শাহ সুলায়মান (রা:), সৈয়দ দেওয়ান চন্দন শহীদ (রা:) ইত্যাদি অনেক মুজাহিদদের তলোয়ারের জোরে। অবশ্য আমার এ কথার অর্থ এই নয় যে, শুধু মুজাহিদদের সশস্ত্র সংগ্রামের ফলেই এদেশে আজ মোসলেম সংখ্যাগরিষ্ট। ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী এই দেশ অস্ত্রের বলে জয় করার আগেও আরব ও অন্যান্য মোসলেমরা ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে এ দেশের বন্দরগুলিতে এসে স্থানীয় লোকজনের সংস্পর্শে আসেন। তখনকার ঐ মোসলেম ব্যবসায়ী ও বণিক মোসলেমরা এখনকার মত মৃত মোসলেম ছিলেন না। তারা যেখানেই যেতেন সেখানেই তারা তাদের জীবন বিধান দীন প্রচারের চেষ্টা কোরতেন। তাদের সে চেষ্টা যে সম্পূর্ণ বিফল হোয়েছে তা আমি বলি না। নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে সব সময়ই এমন মন থাকে যা সত্য গ্রহণ করে এবং অনেক মানুষই নিশ্চয় তাদের হাতে মোসলেম হোয়েছিলেন। কিন্তু বুনিয়াদী সত্য হলো এই যে, প্রধান কারণ হলো মুজাহিদদের সশস্ত্র সংগ্রাম। অতি সম্প্রতি দিনাজপুরের প্রত্যন্ত গ্রামে একটি মসজিদের ভগ্নস্তুপ আবিষ্কৃত হোয়েছে যা হেজরী ৭৯ সনে প্রতিষ্ঠা করা হোয়েছিল বোলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ঐ মসজিদ সুফী দরবেশদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নি, কারণ এসলামে বিকৃত সুফিবাদ প্রবেশ কোরেছে আরও বহু বছর পরে।

এই দেশে মোসলেমরা যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেজন্য যাদের অবদান সর্বশ্রেষ্ঠ, যাদের কয়েকটি মাত্র নাম উল্লেখ কোরলাম তাদের জীবনী পড়লে দেখা যে যায় সশস্ত্র সংগ্রামেই তাদের জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে। সিলেটের শাহজালালের (রা:) মত অনেকের হাতের তলোয়ার আজও রক্ষিত আছে। তারা যে আধ্যাত্মিক সাধকও ছিলেন না তা আমি বোলছি না, তাদের আধ্যাত্মিক সাধনাও অবশ্যই ছিলো কারণ তাদের জীবন প্রকৃত মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদীর মতই ভারসাম্যযুক্ত ছিলো।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের জীবনের সশস্ত্র সংগ্রামের ভাগটুকু ছেটে ফেলে তাদের কেরামতির ভাগটাকেই শুধু প্রধান নয় একমাত্র ভাগ বোলে প্রচার করা হোয়েছে। ঐ প্রচারের চেষ্টায় নানা

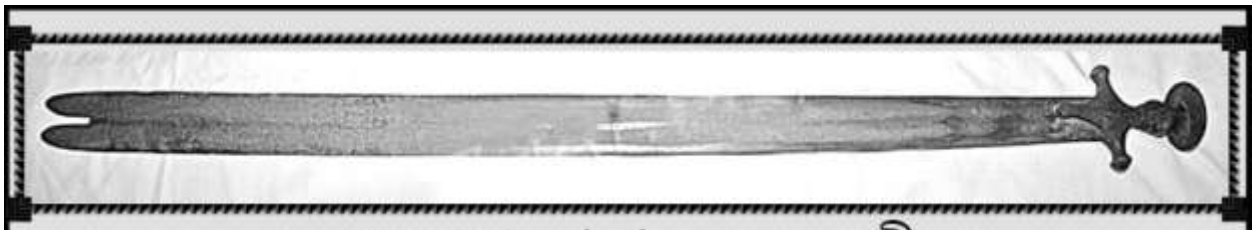

শাহজালাল (র:) এর তরবারী

বলা হোয়ে থাকে, বাংলাদেশে ওলী-আউলিয়া, গাউস-কুতুব, পীর, দরবেশেদের দেশ। তাদের প্রচারেই এ অঞ্চলের মানুষ এসলাম গ্রহণ কোরেছে। তারা তাদের বিরোধিদেরকে কেরামতি শক্তিবলে পরাজিত কোরেছেন। এই ধারণা সত্য নয়। প্রকৃত সত্য হোল- এই দেশে শেষ এসলাম প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে বখতিয়ার খিলজীর তলোয়ারের শক্তিতে। উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশে হোয়েছে শাহজালালের (রঃ) তলোয়ারে, যে তলোয়ার আজ উপেক্ষিত হোয়ে পড়ে আছে। দক্ষিণ বাংলায় হোয়েছে খান জাহান আলীর (রঃ) তলোয়ারে। উত্তর বাংলায় হোয়েছে সুলতান মাহমুদ মাহী সওয়ারের (রঃ) তলোয়ারের শক্তিতে, পশ্চিম বাংলায় হোয়েছে শাহ সফী উদ্দিন (রঃ), শাহ সুলায়মান (রঃ), সৈয়দ দেওয়ান চন্দন শহীদ (রঃ) ইত্যাদি অনেক মোজাহেদদের তলোয়ারের জোরে। এই দেশে মোসলেমরা যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেজন্য যাদের অবদান সর্বশ্রেষ্ঠ, যাদের কয়েকটি মাত্র নাম উল্লেখ কোরলাম তাদের জীবনী পড়লে দেখা যে যায় সশস্ত্র সংগ্রামেই তাদের জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে। সিলেটের শাহ জালালের (রঃ) মত অনেকের হাতের তলোয়ার আজও রক্ষিত আছে। তারা যে আধ্যাত্মিক সাধকও ছিলেন না তা নয়, তাদের আধ্যাত্মিক সাধনাও অবশ্যই ছিলো কারণ তাদের জীবন প্রকৃত মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদীর মতই ভারসাম্যযুক্ত ছিলো। যদিও এরই মধ্যে অনেক বিকৃতিও ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের জীবনের সশস্ত্র সংগ্রামের ভাগটুকু ছেটে ফেলে তাদের কেরামতির ভাগটাকেই শুধু প্রধান নয় একমাত্র ভাগ বোলে প্রচার করা হোয়েছে। ঐ প্রচারের চেষ্টায় নানা অসত্য, অর্দ্ধসত্য কল্পকাহিনী এমনকি সম্পূর্ণ মিথ্যাও তাদের পবিত্র জীবনীগুলোতে ঢুকিয়ে দেয়া হোয়েছে। তাদের মাজারগুলিকে পরিণত করা হোয়েছে ওরস উৎসব আর সিন্নি বিতরণের আখড়াতে। মোজাহেদদের রণদামামায় যে ভূমি একদা প্রকম্পিত হোত, সেখানে আজ বিচরণ করে সংসারবিরাগী, জটাধারী সন্ন্যাসীরা।

অসত্য, অর্ধসত্য কল্পকাহিনী এমনকি সম্পূর্ণ মিথ্যাও তাদের পবিত্র জীবনীগুলোতে ঢুকিয়ে দেয়া হোয়েছে। বিশ্বনবীর (দ:) প্রকৃত উম্মাহ, এসলামের সন্ন্যাসী এই মহাযোদ্ধাদের খানকাবাসী সুফী প্রমাণের জন্য যে সমস্ত বই লেখা হোয়েছে তাদের মধ্য থেকে একটি বই নিন- গোলাম সাকলায়েনের লেখা- বাংলাদেশের সুফী সাধক। দেখুন, এই যোদ্ধাদের সুফী প্রমাণ করার জন্য লেখক লিখছেন- “ফলত বাংলাদেশে মুসলমান যে আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ তার মূলে দেশী ও বিদেশী বহু পীর দরবেশ ও সুফীসাধকদের সাধনা ও কর্ম তৎপরতাই প্রধানত দায়ী। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে কোন কোন সময় কোন কোন ধর্মোন্মত্ত মোসলেম বাদশাহ বা শাসক ক্ষাত্রশক্তির সাহায্যে এদেশে এসলাম বিস্তারের চেষ্টা কোরেছিলেন বটে, কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা সফলকাম হয় নি। মোসলেম ক্ষাত্রশক্তি যেখানে পরাজিত ও বিধ্বস্থ হোয়েছে দরবেশ ও সুফী সাধকদের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি সেখানে অত্যাশ্চার্যরূপে জয়লাভ কোরেছে (বাংলাদেশ সুফী-সাধক- গোলাম সাকলায়েন। পৃ: ৮৭)। এই কথা তিনি লিখলেন বইটার প্রথমদিকে-৮৭ পৃষ্ঠায়। তারপর বহু “সুফী-সাধক”দের বহু

যুদ্ধ, বহু কোরবানী বহু শাহাদাত ও বহু গাজীত্বের বর্ণনার পর বইয়ের শেষ দিকে লিখছেন- “প্রকৃতপক্ষে তুর্কী শাসকদের দ্বারা বাংলাদেশ বিজিত হওয়ার পর সুফী-সাধক এদেশের চিন্তা জগতে অভিনব ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্রপাত করে।” (২৫৫পৃ:) অর্থাৎ গোলাম সাকলায়েন সাহেব প্রথমে ভুল কথা লিখে পরে নিজের অজান্তেই শেষ দিকে সত্য কথা লিখে ফেলেছেন। আরও প্রকৃত সত্য এই যে, প্রথম দিকে এসলামের মুজাহিদদের সশস্ত্র সংগ্রামের ফলে এই দেশে এসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ভারসাম্যহীন, অস্ত্রহীন, তসবীহধারী সুফীদের সময়ে দেশ ইংরাজের গোলামে পরিণত হয়। শুধু ‘দরবেশ” দের সংখ্যাই যদি ধরা হয় তবে প্রথম দিকের ঐ যোদ্ধা দরবেশরা যখন এদেশে এসলাম প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাদের যে সংখ্যা ছিলো, পরবর্তীতে যখন ইংরাজ এসে মুসলমানদের হাতে থেকে দেশ ছিনিয়ে নিলো, তখন “দরবেশ”দের সংখ্যা বহু বেশী। অর্থাৎ যোদ্ধারা ক্ষাত্রশক্তির বলে এদেশে এসলাম আনলেন আর দরবেশদের, সুফীদের আমলে ইংরাজরা এদেশ মোসলেমদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঐ সুফী দরবেশ সহ সমস্ত মোসলেম জাতিটাকে গোলাম বানিয়ে দিলো।

তাসাওয়াফ সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, মো’মেন মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদীর সর্বশ্রেষ্ঠ যে দায়িত্ব, অর্থাৎ এই দীনুল এসলাম, দীনুল কাইয়্যেমাকে সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরে ইবলিসের চ্যালঞ্জে আল্লাহকে জয়ী করার সংগ্রাম, জেহাদ করার পর যদি সময় থাকে তবে তাসাওয়াফের সাধনা কোরুন, কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব পালন না কোরে যদি শুধু সাধনাই কোরতে থাকেন তবে এই দুনিয়াতেই এই জাতির উপর যে আযাব হোচ্ছে তার চেয়েও কঠিন আযাব এবং আখেরাতে আরও ভয়ংকর আযাবের অপেক্ষা কোরুন।

উম্মাহ সম্পর্কে রসুলাল্লাহর একটি ভবিষ্যদ্বাণী

মহানবীর (দ:) ভবিষ্যৎবাণী মোতাবেক ৬০/৭০ বছর পর উম্মতে মোহাম্মদীর মৃত্যু হলো, একথা বহু লোকই মানবেন না জানা কথা। বিশেষ কোরে যারা অতি মোসলেম, যারা এই দীনের মর্মবাণী থেকে বহুদূরে, এর মৃত কঙ্কালটা যারা আঁকড়ে ধোরে আছেন তারা তর্ক দেবেন বিশ্বনবী (দ:) নিজেই বহু হাদীসে আমাদের তাঁর উম্মাহ বোলে বোলেছেন, এমনকি পথভ্রষ্ট হোলেও আমাদের তাঁর উম্মাহ বোলে উল্লেখ কোরেছেন। ঠিক কথা। কিন্তু ঐসব হাদীসে তিনি তাঁর প্রকৃত উম্মাহ বোঝান নি, বুঝিয়েছেন সাধারণভাবে-ইংরেজীতে যাকে বলা হয় In general sense অর্থাৎ অন্য থেকে

পৃথক বোলে বোঝাবার জন্য। অর্থাৎ যেটাকে তিনি উল্লেখ কোরছেন সেটা খ্রিস্টান, ইহুদি জাতি নয়, মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রসুল্লাল্লাহ বলে এমনি একটা পৃথক জাতি- একথা বোঝাবার জন্য। প্রমাণ দিচ্ছি- মহানবী (দ:) ভবিষ্যৎবাণী কোরেছেন যে, ক্রমে ক্রমে ভবিষ্যতে তাঁর জাতি বনী ইসরাইলীদের (এখানে তিনি বনি ইসরাইল বোলতে ইহুদী-খ্রিস্টান সভ্যতাকে বোঝাচ্ছেন) এমনভাবে অনুসরণ কোরবে যে তাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার কোরলে, তাঁর উম্মাহর মধ্য থেকেও কেউ তা কোরবে (হাদীস- আব্দাল্লাহ বিন আমর (রা:) থেকে তিরমিযি, মেশকাত)। প্রশ্ন হোচ্ছে কেউ যদি মানসিকভাবে অন্য জাতির এতটা দাস হোয়ে যায় যে, হীনমন্যতায় সে ঐ পর্যায়ে যায় যে, তাদের নকল ও অনুকরণ কোরতে যেয়ে সে প্রকাশ্যে মায়ের সাথে ব্যভিচার কোরতেও বিরত হয় না, তবে সেই লোককে বা জাতিকে উম্মতে মোহাম্মদী বলা যায়? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু এখানেও বিশ্বনবী (দ:) তাঁর উম্মাহ বোলেই উল্লেখ কোরেছেন, কারণ এই জাতিটিকে অন্য জাতি থেকে পৃথক কোরে বোঝাবার জন্য In general sense, তিনি তাঁর প্রকৃত উম্মাহ বোঝান নি।

মহানবীর (দ:) ভবিষ্যবাণী মোতাবেক ৬০/৭০ বছর পর যখন উম্মতে মোহাম্মদীর জাতি হিসাবে মৃত্যু হোলো তখন কি রইলো? রইলো জাতি হিসাবে মোসলেম। মোসলেম শব্দের অর্থ হলো- যে বা যারা আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থাকে তসলীম অর্থাৎ সসম্মানে গ্রহণ কোরে নিজেদের জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা করে, অন্য কোন রকম জীবন বিধানকে স্বীকার করে না, সে বা তারা হলো মোসলেম। এই জাতি রসুলাল্লাহর (দ:) প্রকৃত সুন্নাহ অর্থাৎ তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত দীনকে সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার সশস্ত্র সংগ্রাম ছেড়ে দেবার ফলে জাতি হিসাবে প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর সংজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হোয়ে শুধু একটি মোসলেম জাতিতে পরিণত হলো। এ জাতির সংবিধান রইলো কোর'আন ও হাদীস, রাজনৈতিক, আর্থ সামাজিক সবরকম ব্যবস্থা শাসন ও দণ্ডবিধি (Penal Code) সবই রইলো ঐ কোর'আন ও হাদীস মোতাবেক। ওর বাইরে অন্য কোন রকম রাজনৈতিক বা আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাকে তারা শেরক বা বহু ঈশ্বরবাদ মনে কোরতেন। কিন্তু তা সত্তেও তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য তারা হারিয়ে ফেলেছিলেন, তাদের আকীদা বিকৃত হোয়ে গিয়েছিলো। কাজেই তারা ঐ বিশাল ভূখণ্ডের শাসক হোয়ে পৃথিবীর আর দশটা রাজ্যের মত রাজত্ব কোরতে লাগলেন। এই অবস্থায় কয়েক'শ বছর পার হোয়ে গেলো।

এসলামের স্বর্ণযুগ

আমি এইখানে একটু থামবো। কারণ এই সময় থেকে নিয়ে কয়েকশ' বছর পর এই জাতির পতন ও ইউরোপের অন্যান্য জাতিগুলির কাছে যুদ্ধে হেরে যেয়ে তাদের গোলামে পরিণত হওয়া পর্যন্ত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তা করার আছে। উদ্দেশ্য ভুলে যেয়ে পৃথিবীতে এই দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যখন এই জাতি বন্ধ করলো, ঠিক তখনকার পরিস্থিতি এই রকম।

ক) পৃথিবীর দুইটি বিশ্ব শক্তিকে উম্মতে মোহাম্মদী সশস্ত্র সংগ্রামে পরাজিত কোরেছে।

খ) একটি (পারস্য) এই শেষ জীবন ব্যবস্থাকে স্বীকার ও গ্রহণ কোরে এই জাতির অন্তর্ভুক্ত হোয়ে গেছে ও অন্যটি (পূর্ব রোমান অর্থাৎ বাইজেনটাইন) তার সাম্রাজ্যের বেশির ভাগ হারিয়ে শক্তিহীন ও দুর্বল হোয়ে গেছে। খ্রিস্টান শক্তি বোলতে তখন ইউরোপের ছোট ছোট কয়েকটি রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছু নেই।

গ) উম্মতে মোহাম্মদী যদি তখন তাদের উদ্দেশ্য ভুলে না যেতো তবে পৃথিবীময় এই শেষ জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠায় আর কোন বড় বাধা ছিলো না। থাকলেও তা ঐ দুই বিশ্বশক্তির মতই পরাজিত হতো। সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠিত হতো, আল্লাহ তাঁর শেষ রসুলকে (দ:) যে দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন' (কোর'আন- সুরা আল ফাতাহ ২৮। আত তওবা ৩৩, আস্ সফ ৯) তা পূর্ণ হতো, পৃথিবী থেকে অন্যায় অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত বন্ধ হোয়ে পূর্ণ শান্তিতে মানব জাতি বাস কোরতে পারতো, মালায়েকদের আশংকা মিথ্যা হতো, ইবলিসের মাথা নত হোয়ে যেতো, বিশ্বনবীকে আল্লাহর দেয়া রহমাতুল্লীল আলামীন উপাধির অর্থ পূর্ণ হতো।

ঘ) এই সংগ্রাম যখন আরম্ভ হোয়েছিলো তখন উম্মতে মোহাম্মদীর মোট জনসংখ্যা পাঁচ লাখেরও কম। কোন প্রাকৃতিক সম্পদ নেই, পৃথিবীর দরিদ্রতম জাতিগুলির অন্যতম, যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র নিুতম প্রয়োজনের চেয়েও কম। আর প্রতিপক্ষ তদানিন্তন পৃথিবীর দুই মহাশক্তি, জনসংখ্যায়, সম্পদে সুশিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যায় অস্ত্র ও সরঞ্জামে এক কথায় কোনদিক দিয়েই তুলনা চলে না। আর ৬০/৭০ বছর পর যখন এ সংগ্রাম বন্ধ করা হলো তখন পরিস্থিতি ঠিক

আল রাজী (রসায়ন, দর্শন) | আল বিরুনী (বিজ্ঞান) | আল জাবির ইবনে হাইয়ান (রসায়ন শাস্ত্রের জনক) | ইবনে রুশ্‌দ (যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন)

আবু আব্দাল্লাহ আল বাত্তানী (জ্যোতির্বিদ্যা) | ইবনে আল হাইসাম (আলোকবিদ্যা) | ইবনে সীনা (চিকিসকদের চিকিৎসক) | ইবনে খালদুন (দর্শন, ইতিহাস, গণিত)

আল ফারগানী গনিত ও জ্যোতির্বিদ্যা | আল খোয়ারেজমী (বীজগণিতের আবিষ্কারক) | আবু আল নাসির আল ফারাবী (যুক্তিবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, দর্শন) | আল নাফীস (চিকিৎসাবিদ্যা)

উলটো। এই নিঃস্ব জাতি আটলান্টিকের তীর থেকে চীনের সীমান্ত আর উত্তরে উরাল পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের তীর পর্যন্ত বিশাল এলাকার শাসনকর্তা। তখন আর নিঃস্ব নয়, তখন সম্পদে, সামরিক শক্তিতে জনবলে প্রচণ্ড শক্তিধর পৃথিবীর কোন শক্তির সাহস নেই এই জাতির মোকাবেলা করার। অর্থাৎ প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী যারা নিঃসংশয়ে জানতেন তাদের নেতার (দ:) জীবনের উদ্দেশ্য কী ছিলো এবং তাদের নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্যই বা কী তারা

ডাইনে বামে কোনও দিকে না চেয়ে একাগ্র লক্ষ্যে (হানিফ) সেই উদ্দেশ্য অর্জনে পার্থিব সব কিছু কোরবান কোরে পৃথিবীতে বের হোয়ে পড়ে ছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তাদের সঙ্গে ছিলেন। আর স্বয়ং আল্লাহ যাদের সাথে তারা কেমন কোরে বিফল হবে, কেমন করে পরাজিত হবে? তাই মানব ইতিহাসে দেখি এক অবিশ্বাস্য অধ্যায়। অজ্ঞাত, উপেক্ষিত ছোট্ট একটি নিঃস্ব জাতি অল্প সময়ের (৬০/৭০ বছর) মধ্যে মহাপরাক্রমশালী দুইটি বিশ্ব শক্তিকে পরাজিত কোরে প্রায় অর্ধেক পৃথিবীতে ন্যায় বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করলো। উম্মাহর উপর দায়িত্ব দেয়া কাজের এই পর্যন্ত অগ্রগতি হওয়ার পর দুর্ভাগ্যক্রমে এই উম্মাহ তার আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভুলে গেলো, এর আকীদা নষ্ট হোয়ে গেলো, পৃথিবীতে শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠার বদলে তাদের আকীদা হোয়ে গেলো রাজত্ব করা, অন্য দশটা সাম্রাজ্যের মত। এই উম্মাহকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হোয়েছিলো সে কাজ ত্যাগ কোরে সে অন্য পথ ধরলো।

কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ত্যাগ কোরলেও যেহেতু তারা এই শেষ জীবন ব্যবস্থা, দীনের উপরই মোটামুটি কায়েম রোইলো তাই এর সুফলও তারা লাভ করলো। কোর'আনের ও হাদীসের নির্দেশ মোতাবেক শাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করার ফলে জাতি আইন শৃঙ্খলা ও সম্পদ বিতরণে অপূর্ব সাফল্য লাভ করলো, আল্লাহ ও রসুলের (দ:) জ্ঞান আহরণের আদেশ উৎসাহ ভরে পালন কোরে অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর শিক্ষকের আসনে উপবিষ্ট হলো। যে সময়টার (Period) কথা আমি বোলছি অর্থাৎ জাতি হিসাবে সংগ্রাম ত্যাগ কোরে উম্মতে মোহাম্মদীর সংজ্ঞা থেকে পতিত হওয়া থেকে কয়েকশ' বছর পর ইউরোপের বিভিন্ন জাতির পদানত ও গোলামে পরিণত হওয়া পর্যন্ত এই যে সময়টা, এই সময়টা পার্থিব হিসাবে অর্থাৎ রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ইত্যাদিতে এক কথায় উন্নতি ও প্রগতি বোলতে যা বোঝায় তাতে এই জাতি পৃথিবীর সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হোয়ে রোইলো। শেষ নবীর (দ:) মাধ্যমে শেষ জীবন ব্যবস্থা মোটামুটি নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করার অনিবার্য ফল হিসাবে এই জাতি এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হলো যে, তদানিন্তন বিশ্ব সভয়ে ও সসম্ভ্রমে এই জাতির সামনে নতজানু হোয়ে পড়েছিলো। এই সময়ে এই জাতির সাফল্য, কীর্তি, বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জন, গবেষণা, পৃথিবীর অজানা স্থানে অভিযান ইত্যাদি প্রতি বিষয়ে যে সাফল্য লাভ কোরেছিলো তার বিবরণ এখানে দেওয়ার স্থান নেই এবং প্রয়োজনও নেই। এ ব্যাপারে বহু বই কেতাব লেখা হোয়ে গেছে। এই সময় (Period) টাকেই বলা হয় এসলামের স্বর্ণযুগ।

কিন্তু এত কিছুতেও কোন লাভ নেই- কারণ আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হোলে বাকি আর যা কিছু থাকে সবই অর্থহীন। এ সত্য রসুলাল্লাহর (দ:) ঘনিষ্ঠ সহচর এই জাতির প্রথম খলিফা আবু বকর (রা:) জানতেন। তাই খলিফা নির্বাচিত হোয়ে তার প্রথম বক্তৃতাতেই তিনি উম্মতে মোহাম্মদীকে সম্বোধন কোরে বলেছিলেন- হে মোসলেম জাতি! তোমরা কখনই সংগ্রাম (জেহাদ) ত্যাগ কোরোনা। যে জাতি জেহাদ ত্যাগ করে- আল্লাহ সে জাতিকে অপদস্থ, অপমানিত না কোরে ছাড়েন না। আবু বকর (রা:) এ কথা তাঁর প্রথম বক্তৃতাতেই কেন বোলেছিলেন? তিনি বিশ্বনবীর (দ:) ঘনিষ্ঠতম সাহাবাদের একজন হিসাবে এই দীনের প্রকৃত মর্মবাণী, হকিকত তাঁর নেতার কাছ থেকে জেনেছিলেন। বিশ্বনবীর কাছ থেকে জানা ছাড়াও আবু বকর (রা:) আল্লাহর দেয়া সতর্কবাণীও কোর'আনে নিশ্চয়ই পড়েছিলেন যেখানে আল্লাহ এই মো'মেন জাতি ও উম্মতে মোহাম্মদীকে লক্ষ্য কোরে বোলছেন- যদি তোমরা (জেহাদের) অভিযানে বের না হও তবে তোমাদের কঠিন শাস্তি (আযাব) দেবো এবং তোমাদের বদলে (তোমাদের পরিত্যাগ কোরে) অন্য জাতিকে মনোনীত করবো (কোর'আন- সুরা আত তওবা ৩৮)। এই জাতি যে একদিন তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হোয়ে যাবে, সশস্ত্র সংগ্রাম ছেড়ে দেবে ফলে আল্লাহর গযবে পতিত হবে তাও বোধহয় তিনি তাঁর প্রিয় নেতার (দ:) কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন। তাই খলিফার দায়িত্ব হাতে নিয়ে তিনি সর্বপ্রথম সেই সম্বন্ধেই জাতিকে সতর্ক কোরে দিলেন। শুধু আবু বকর (রা:) নয়, তারপর ওমর (রা:), ওসমান (রা:) এবং আলী (রা:) ও যে ঐ মর্মবাণী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন তার প্রমাণ এই যে, তাদের সময়েও এই শেষ জীবন ব্যবস্থাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাওয়া হোয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদা তো নয়ই এমনকি মহানবীর (দ:) একজন মাত্র সাহাবাও কোনদিন এই সশস্ত্র সংগ্রামের বিরতির জন্য একটিমাত্র কথা বোলেছেন বোলে ইতিহাসে প্রমাণ নেই। বরং প্রতিটি সাহাবা তাদের পার্থিব সব কিছু কোরবান কোরে স্ত্রী পুত্রকে আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়ে বছরের পর বছর আরব থেকে বহু দূরে অজানা অচেনা দেশে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। আবু বকরের (রা:) মত তারাও জানতেন যে, এই সংগ্রাম বিশ্বনবীর (দ:) উপর আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব, যা তাঁর উম্মাহ হিসাবে তাদের উপর এসে পড়েছে। তারা জানতেন এ সংগ্রাম ত্যাগ করার অর্থ উম্মতে মোহাম্মদীর গণ্ডি থেকে তাদের বহিঃষ্কার, আল্লাহর রোষানলে পতিত হওয়া ও পরিণামে আল্লাহর শত্রুদের হাতে পরাজিত, অপমান, অপছন্দ ও লাঞ্ছনা, যা আবু বকর (রা:) বলেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক জাতি সেই কাজটিই কোরল। তারা

জাতির মধ্যে সৃষ্ট আলেম-পণ্ডিতদের দীনের অতি-বিশ্লেষণের কারণে বিভিন্ন মাজহাব ও ফেরকায় বিভক্ত হোয়ে গেল এবং সুফি-দরবেশদের বিকৃত তাসাউফের অনুসরণ কোরে বহির্মুখী, বিস্ফোরণমুখী চরিত্র হারিয়ে অন্তর্মুখী হোয়ে গেল। ফলে তারা হোয়ে গেল ইউরোপীয় খ্রিস্টান জাতিগুলির গোলাম।

উম্মাহর পচনক্রিয়া

যে সময়টার (Period) কথা এখানে আলোচনা করছি- সংগ্রাম থামিয়ে দেওয়া থেকে ইউরোপীয় শক্তিগুলির দাসে পরিণত হওয়া পর্যন্ত কয়েকশ' বছর- একেই বলা হয় এসলামের স্বর্ণ যুগ, কারণ একটু আগে বোলে এসেছি। এলাকায়, জনসংখ্যায়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে, শিক্ষায়, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে এক কথায় সর্বতোভাবে এই জাতি এই সময়টায় পৃথিবীতে সর্বোচ্চ। এই বিস্ময়কর উন্নতি এই জাতি কোরতে পেরেছিলো, তার কারণ মুল বিষয়ে ব্যর্থ হোলেও মোটামুটিভাবে এই জাতির সংবিধান ছিলো কোর'আন ও সুন্নাহ। অন্য কোন রকম জীবন বিধানকে স্বীকার কোরে না নিয়ে কোর'আন ও সুন্নাহ মোতাবেক জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবন ও দণ্ডবিধি পরিচালনা করার দরুণ এই সময়কালের এই জাতিটাকে মোসলেম বলা যায়। কিন্তু বিশ্বনবীর (দ:) আরদ্ধ কাজ ত্যাগ করার দরুন এখন আর একে জাতি হিসাবে উম্মতে মোহাম্মদী বলা যায় না। এই কয়েকশ' বছরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে এই 'মোসলেম' জাতির মধ্যে যে পরিবর্তনগুলি এলো তা গভীরভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

ক) ফকীহ মুফাস্সের, পণ্ডিতদের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফলে ক্রমে ক্রমে জাতি নানা মাযহাবে ও ফেরকায় বিভক্ত হোয়ে যেয়ে এর ঐক্য সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হোয়ে গেলো, শক্তি শেষ হোয়ে গেলো।

খ) সুফীদের অনুপ্রবেশ ও প্রভাবে জাতি মানসিকভাবে নির্জীব হোয়ে গেলো।

গ) ঐ দুইটির সম্মিলিত প্রভাবে উম্মাহর বহির্মুখী (Extrovert) ও বিস্ফোরণমুখী (Explosive) চরিত্র অন্তর্মুখী (Introvert) ও অনড় (Inert) হোয়ে গেলো। জাতি স্থবির, মৃত হোয়ে গেলো। যার গতি নেই তাই মৃত।

ঘ) এই মৃত অবস্থায় জাতির পচনক্রিয়া (Decomposition) চোলতে লাগলো।

এই পচনক্রিয়া যে কয়েকশ' বছর ধরে চোললো এই সময়টায় কিন্তু এই উম্মাহর শত্রুরা বোসে ছিলো না। তারা ক্রমাগত চেষ্টা কোরে চোলছিলো এই জাতিকে ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু এই উম্মাহর জনক মহানবী (দ:) এর মধ্যে যে বিপুল পরিমাণ সামরিক গুণ ও চরিত্র সৃষ্টি কোরে দিয়েছিলেন তার প্রভাবে ইউরোপীয়ান শক্তিগুলি কোন বড় রকমের বিজয় লাভ কোরতে পারে নি। কিন্তু ফকীহ, মুফাস্সের ও সুফীদের প্রভাবে উম্মাহর আকীদা বিকৃত হোয়ে যাবার ফলে পচনক্রিয়া আরও যখন ভয়াবহ হোয়ে উঠলো তখন আর এই জাতির শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি রোইল না। মনে রাখতে হবে, সমস্ত ফকীহ, মুফাস্সের ও পীর দরবেশদের আবির্ভাব হয় এই সময়কালেই (Period)। এদের মতবাদের বিষ কেমন কোরে এই উম্মাহকে ইউরোপী খ্রিস্টানদের ক্রীতদাসে পরিণত কোরেছে তার একটি মাত্র উদারহণই বোধহয় উন্মুক্ত মনের মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে।

শেষ জীবন ব্যবস্থাকে সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে অর্থাৎ রসুলাল্লাহর (দ:) প্রকৃত সুন্নাহ

এসলামের স্বর্ণযুগের পণ্ডিত, ফকীহ, মুফাস্সের মোহাদ্দিসরা যে অক্লান্ত ও অপরিসীম পরিশ্রম কোরেছেন তা পড়লে, চিন্তা কোরলে বিস্ময়ে অবাক হোয়ে যেতে হয়। কিন্তু এরা সবাই বিশ্বনবীর (দ:) জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় যে ভাগটি সেটাকে যর্থার্থ গুরুত্ব দেন নি, সেটা হলো মহানবীর (দ:) জীবনের সামরিক ভাগ। যদিও তাঁর এবং তাঁর আসহাবদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই ব্যয় হোয়েছে যুদ্ধে ও যুদ্ধের আয়োজনে।

সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ কোরে এই দীনের মসলা-মাসায়েলের সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ কোরে, নানা মাযহাব ফেরকা সৃষ্টি কোরে এই জাতিটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার কাজে যখন পণ্ডিতরা ব্যস্ত, শাসকরা যখন মহা জাকজমক, শান-শওকতের সঙ্গে রাজত্ব করায় ব্যস্ত তখনও এই জাতির সমস্ত মানুষ মরে যায় নি। মহানবী (দ:) তাঁর শিক্ষায় যে সামরিক প্রেরণা উম্মাহর বুকে প্রোথিত কোরে দিয়েছিলেন, যা বটগাছের শেকড়ের মত স্থান

কারে নিয়েছিলো, তা তখনও সম্পূর্ণ মরে যায় নি। কিন্তু ঐ সামরিক প্রেরণা তখন পরিবর্তন হোয়ে আত্মরক্ষামূলক (Defensive) হোয়ে গেছে। এই জাতির সীমান্ত তখন উত্তরে আটলান্টিকের তীর থেকে ভূমধ্য সাগরের তীর ধরে উরাল পর্বত মালা পর্যন্ত, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকার আটলান্টিকের তীর, পূর্বে পূর্ব ভারত। এর মধ্যে শত্রুর আক্রমণের আশংকা ছিলো শুধুমাত্র ইউরোপের দিক থেকে। কারণ অন্য দিকে গুলোয় এমন কোন শক্তি ছিলো না যেটা এই জাতিকে আক্রমণ করার সাহস করে। এই উত্তর সীমান্তে আক্রমণ কোরতে হোলে শত্রুকে ভূমধ্যসাগর পার হোয়ে এপারে এসে নামতে হবে। এই উত্তর সীমান্তকে রক্ষা করার জন্য মোসলেম জাতি মরক্কো থেকে ভূমধ্য সাগরের উপকূল বরাবর পূর্বদিকে পারস্য পর্যন্ত অসংখ্য ছোটবড় দুর্গ তৈরি কোরেছিল। এ দুর্গগুলির নাম দেয়া হোয়েছিলো রেবাত। শব্দটি নেয়া হোয়েছিলো কোর'আনের সুরা আনফালের ৬০নং আয়াত থেকে যেখানে আল্লাহ উম্মাতে মোহাম্মদীকে

তিউনেশিয়ার মোনাস্তির রিবাত। রিবাত শব্দটি আব্বাসীয় যুগে ব্যবহৃত হোত সীমান্ত সামরিক ঘাঁটি (frontier post) হিসাবে, যেখানে মুসাফিররা, বিশেষ কোরে মোজাহেদরা অবস্থান কোরতেন, প্রশিক্ষণ নিতেন, এতে শত্রুর গতিবিধি নিরীক্ষণ করার জন্য Watch tour থাকতো। জাতি যখন যুদ্ধ করা পরিত্যাগ কোরল তখন এই রেবাতগুলি সুফি, দরবেশ, পীর, মাশায়েখ সম্প্রদায় ও তাদের মুরিদানের খানকা বা আখড়ায় পরিণত হোল।

আদেশ কোরছেন শত্রুর মোকাবিলার জন্য তোমরা যথাসাধ্য সামরিক সরঞ্জাম, অশ্ববাহিনী ইত্যাদি একত্র কোরে সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক (কোর'আন- আল আনফাল ৬০)। এই প্রস্তুতির স্থানটাকে আল্লাহ কোর'আনে রেবাত বোলেছেন- যার অর্থ হলো সামরিকভাবে একটি সুরক্ষিত স্থান। এই রেবাতগুলিতে একটি কোরে নিরীক্ষণ মঞ্চ (Watch tower) থাকতো। শত্রু আক্রমণ কোরলে তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের ভেতরে ও আশেপাশের স্থানীয় লোকদের সতর্ক কোরে দেওয়া ও নিজেরা শত্রুদের প্রতিরোধ করা ছিলো এই দুর্গ বা রেবাতগুলির উদ্দেশ্য। তখনকার দিনে এখনকার মতো পাশ্চাত্যের অনুকরণে আলাদা সামরিক বাহিনী (Standing Army) ছিলো না, গোটা জাতিটাই, উম্মাহটাই ছিলো একটা বাহিনী, প্রত্যেক মোসলেম একটি সৈন্য। তাই যেখানে যে রেবাত তৈরি করা হোয়েছিলো সেখানকার আশেপাশের লোকেরা দল বেঁধে পালাক্রমে ঐ রেবাতে বাস করতেন এবং শত্রুর আক্রমণ আসে কিনা তা লক্ষ্য করতেন। যে যতদিন সম্ভব ঐ দুর্গগুলিতে কাটাতে চেষ্টা কোরেছেন। এমনও দেখা গেছে কেউ কেউ বছরের পর বছর রেবাতে সামরিক জীবন যাপন কোরেছেন। রেবাত শব্দটি যেমন কোর'আন থেকে নেয়া হোয়েছিলো তেমনি মহানবীর (দ:) বাণী, "একরাত সীমান্ত প্রহরা দেয়া হাজার বছর নফল এবাদতের সওয়াবের সমান (হাদীস- ওসমান (রা:) থেকে তিরমিযি, মেশকাত), এই মুজাহীদদের প্রেরণার কারণ ছিলো। এই রিবাতগুলির মধ্যে এরা প্রহরীর কাজ কোরতেন, কুচকাওয়াজ কোরতেন, অস্ত্র ও যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতেন। অবশ্যই সালাত, সওমও পালন কোরতেন ফরদ হিসাবে। তাছাড়া এ জাতির সালাত তো সামরিক কুচকাওয়াজেরই অন্য সংস্করণ। উত্তর আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরের উপকুল বরাবর এই বহুসংখ্যক রেবাতগুলির সতর্ক প্রহরা ও প্রতিরোধের মুখে খ্রিস্টান শত্রু বহুবার আক্রমণ কোরেও মোসলেমদের কাবু কোরতে পারে নি, পরাজিত হোয়ে পালিয়ে গেছে। এসলামের প্রথম অর্থাৎ গতিশীল (Dynamic) যুগ (মহানবীর (দ:) কথিত ৬০/৭০ বছর) শেষ হোয়ে যাবার পর থেকে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীরও পর পর্যন্ত এই কয়েকশ' বছর সীমান্ত রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ এই মুজাহিদরা অস্ত্র হাতে এই পতনোন্মুখ ও পচনশীল জাতিকে রক্ষা কোরেছেন।

একদিকে ঐ মুজাহিদরা কোর'আন ও সুন্নাহর আদর্শে অনুপ্রাণিত হোয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম কোরে জাতিকে রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছেন সীমান্তে, অপরদিকে জাতির ভেতর পচনক্রিয়া দ্রুত প্রসার লাভ কোরছে। যথাসময়ে এই পচনক্রিয়া ঐ রেবাত লাইনেও প্রবেশ করলো। প্রবেশ করলো

লাইনের পূর্ব প্রান্তে পারস্য দেশের দিক থেকে বিকৃত তাসাওয়াফরূপে। কিছু দিনের মধ্যেই ঐ রেবাতগুলি দুর্গ থেকে বোদলে হোয়ে গেল সুফীদের আশ্রম আর রেবাতগুলির মুজাহিদরা হোয়ে গেলেন দরবেশ, সুফী। এমনকি এগুলির আরবী নাম রেবাত পর্যন্ত বোদলে হোয়ে গেলো ফারসী শব্দ খানকাহ। এরপর কী হলো তা ইতিহাস। এরপর শত্রু আক্রমণ কোরতে এসে কোন বাধার সম্মুখীন হলো না কারণ তখন তারা মুখোমুখী হলো তলোয়ার হাতে মুজাহিদদের নয়, তসবিহ হাতে খানকাহবাসী, মঠবাসী সুফীদের। দু'চারটি জায়গা ছাড়া সমস্ত মোসলেম পৃথিবী শত্রুর পদানত দাসে পরিণত হলো। মুজাহিদদের তলোয়ার যা কয়েক শতাব্দীরও বেশি রক্ষা কোরেছিল, সুফীদের আধ্যাত্মিক শক্তিও তসবিহ তা রক্ষা কোরতে পারলো না (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পৃ: ৩৯৮)।

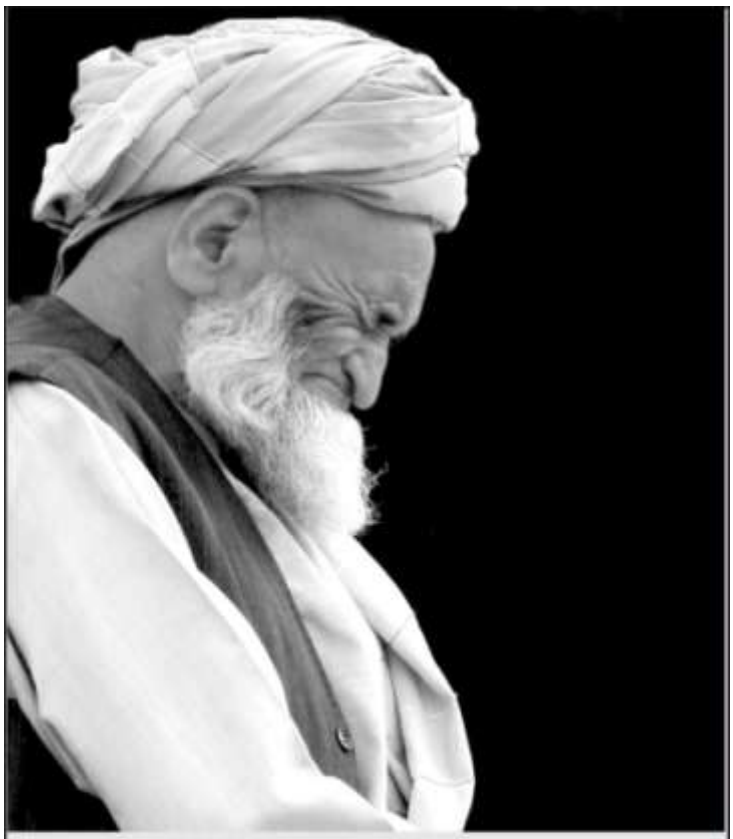

দুর্দান্ত টর্নেডোর মত গতিশীল উম্মতে মোহাম্মদীকে নিঃসাড়, নির্জীব কোরে অন্তর্মুখীতায় বুঁদ কোরে দেয় ভারসাম্যহীন সুফিবাদ। যোদ্ধা জাতি অস্ত্র ছেড়ে তসবীহ নেয়, যুদ্ধ ছেড়ে অজিফা পাঠ কোরে রীপুজয়ী পীর-বুজুর্গ হওয়ার সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। পরিণতিতে জাতির ভাগ্যে নেমে আসে করুণ দাসত্ব, যার ঘানি আমরা আজও টেনে যাচ্ছি।

সেই যে দাসত্ব, গোলামী শুরু হোল, আজও সেই দাসত্বই চোলছে। সারা পৃথিবীতে এই জাতি অন্য জাতির পায়ের তলায় গড়াগড়ি খায়। এই গোলাম অবস্থা থেকে তারা মো'মেন, মোসলেম আর উম্মতে মোহাম্মদী হওয়ার পরিবর্তে তারা হোচ্ছে আলেম, মুফতি, মোফাসসের, পীর, বুজুর্গ, শায়েখ ইত্যাদি। কোন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি আবার এই হতভাগা, মৃত জাতিকে জাগ্রত করার জন্য আল্লাহর প্রকৃত এসলামের দিকে আহ্বান করেন, তখন এই আলেম, পীর, বুজুর্গ, দরবেশ, আউলিয়া, সুফি, সাধক নামের ধর্মব্যবসায়ীরা এই জাতিকে অন্তর্মুখিতায় বুঁদ কোরে রাখেন। এদের কারণেই সকল ধর্মকে একচেটিয়াভাবে

“আফিম” বোলে আখ্যা দিয়েছেন কার্ল মার্কস ও তার পদাঙ্কের অনুসারীরা। সাধারণ জনগণকে সত্য জানতে দেন না। এনশা’আল্লাহ এই অবস্থায় তারা বেশিদিন রাখতে পারবেন না। অচীরেই এ জাতির কালঘুম ভাঙবে তারা আবার জাগবে। এবার অর্ধ পৃথিবী নয়, সম্পূর্ণ পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা কোরবে।

আল্লাহর রসুল ছিলেন যোদ্ধানবী

যে সময়টার (Period) কথা এখানে আলোচনা করছি- সংগ্রাম থামিয়ে দেওয়া থেকে ইউরোপীয় শক্তিগুলির দাসে পরিণত হওয়া পর্যন্ত– কয়েকশ’ বছর, এই সময়কালের মধ্যে এই জীবন ব্যবস্থার ও এই উম্মাহর একটি ভয়ংকর ক্ষতি করা হলো। চুলচেরা বিশ্লেষণের ফলে যে অনৈক্য ও ফেরকা মাযহাব সৃষ্টি হলো তা ভবিষ্যতে এনশাল্লাহ লুপ্ত হোয়ে যেয়ে আবার আগের মত কঠিন ঐক্য এই উম্মাহর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে- যখন এই উম্মাহ আবার তার প্রকৃত আকীদা ফিরে পাবে। বিকৃত তাসাওয়াফের অন্তমুর্খী চরিত্রের ও সেরাতুল মোস্তাকীম ছেড়ে দিয়ে দীনের অতি বিশ্লেষণের বিষময় ফল উপলব্ধি কোরে উম্মাহ এনশাল্লাহ আবার একদিন সেরাতুল মোস্তাকীমের সহজ, সরল রাস্তায়, দীনুল কাইয়্যেমাতে অর্থাৎ তওহীদে ফিরে আসবে। কিন্তু এখন যে ক্ষতির কথা বোলছি সে ক্ষতির পূরণ কঠিন হবে। সেটা হলো এই, এই সময়কালের পণ্ডিত, ফকীহ, মুফাস্সের মোহাদ্দিসরা যে অক্লান্ত ও অপরিসীম পরিশ্রম কোরেছেন এই দীনের কাজে, তা পড়লে, চিন্তা কোরলে বিস্ময়ে অবাক হোয়ে যেতে হয়। বিশেষ কোরে মোহাদ্দেসরা রসুলাল্লাহর (দ:) হাদীস সংগ্রহ ও যাচাই কোরতে যে অধ্যবসায়, পরিশ্রম আর কোরবানী কোরেছেন তার তুলনা মানুষের ইতিহাসে আর নেই। কিন্তু এরা সবাই বিশ্বনবীর (দ:) জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় যে ভাগটি সেটাকে যথার্থ গুরুত্ব দেন নি, সেটা হলো মহানবীর (দ:) জীবনের সামরিক ভাগ। অবশ্য এটাকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতে পারেন নি কারণ কোর’আনে স্বয়ং আল্লাহ যে তাঁর নবীকে (দ:) সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে এই জীবন ব্যবস্থা, দীনকে প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছেন (কোর’আন- সুরা আল ফাতাহ ২৮, আত তওবা ৩৩, সূরা আস-সাফ ৯)। এই উম্মাহকে যে আদেশ দিয়েছেন সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে, যে পর্যন্ত না পৃথিবী থেকে যুলুম, অত্যাচার, অশান্তি আর রক্তপাত দূর হোয়ে শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠিত হয় (কোর’আনে সূরা আনফাল ২২-২৩)।

এগুলো তো আর বাদ দেয়া সম্ভব নয়। তারপর বিশ্বনবীর (দ:) জীবনী লিখতে গেলে তিনি যে সমস্ত জেহাদে, কিতালে এবং গাযওয়াতে (যুদ্ধ) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সে সব লিখতেই হোয়েছে। কিন্তু লিখলেও তারা সেগুলির প্রাধান্য দেন নি, প্রাধান্য দিয়েছেন তার জীবনের অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোয়। যে মানুষটির জীবনের মাত্র নয় বছরের মধ্যে আটাত্তরটি যুদ্ধ হোয়েছে যার সাতাশটি যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তার মধ্যে নিজে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ কোরেছিলেন নয়টিতে, সাংঘাতিকভাবে যখম হোয়েছিলেন আর বিভিন্ন দিকে সামরিক অভিযান পাঠিয়েছিলেন পঁয়ত্রিশটি, যেগুলির সমরনীতি এবং ব্যবস্থাপনা তাকেই কোরতে হোয়েছিল, সে মানুষের জীবনটাকে প্রায় নিরবিচ্ছিন্ন যোদ্ধার জীবন বোলতে আপত্তির কোন কারণ আছে? প্রতিটি যুদ্ধের আগে কত রকম প্রস্তুতি নিতে হোয়েছে। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা, সেগুলোর কার্যকারিতা পরীক্ষা, শত্রুপক্ষের অবস্থান ও চলাচল, তাদের সংখ্যা ও অস্ত্র শস্ত্রের সংবাদ (Intelligent) শত্রুর ও নিজেদের রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি কত রকমের কত বন্দোবস্ত কোরতে হোয়েছে, তার উপর প্রতি যুদ্ধের বিভিন্ন রকমের সমস্যা উদ্ভুত হোয়েছে। সেগুলির সমাধান কোরতে হোয়েছে এই ব্যাপারে ঐ সময়ের পণ্ডিতদের কাছ থেকে আমরা এখন যে তথ্য পাই তা অন্যান্য বিষয়ের তথ্যাদির তুলনায় অতি সামান্য। অথচ যাঁকে অতগুলি যুদ্ধ কোরতে হোয়েছিলো তাঁর সম্পর্কে লিখতে গেলে তাঁর সামরিক জীবনের খুঁটিনাটিই মুখ্য হোয়ে দাঁড়াবার কথা। কিন্তু হোয়েছে উল্টো। মহানবীর (দ:) ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি কম প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলোর পুংখানুপুংখ বিবরণ তাদের লেখায় আছে কিন্তু তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক সংগ্রামের দিক এত কম স্থান পেয়েছে যে, মনে হয় তারা এটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কোরেছেন।

এর কারণ আছে। এই ফকীহ, মুফাস্সের, মোহাদ্দিস এরা সবাই আবির্ভূত হোয়েছিলেন এই উম্মাহ তার নেতার (দ:) প্রকৃত সুন্নাহ অর্থাৎ সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীতে এই দীন প্রতিষ্ঠা কোরে শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠা করার সুন্নাহ ত্যাগ করার পর। এই উম্মাহ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য তখন তাদের সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হোয়ে গেছে, আকীদা বিকৃতি হোয়ে গেছে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হারিয়ে গিয়েছিলো বোলেই তো তারা সংগ্রাম ত্যাগ কোরে খাতা কলম নিয়ে ঘরে বোসেছিলেন এই দীনের চুলচেরা বিশ্লেষণ কোরতে, আরেক দল এসবও কিছু না কোরে খানকায় ঢুকে তাদের আত্মার ঘষামাজা কোরতে শুরু কোরেছিলেন, নেতার (দ:) প্রকৃত সুন্নাহ সংগ্রাম মুষ্ঠিমেয় লোক ছাড়া কারোরই সম্মুখে ছিলো না। সুতরাং তারা যে ঐ সংগ্রাম সম্বন্ধে নিরুৎসুক, অনাগ্রহী হবেন তা স্বাভাবিক।

তাই তাদের সারাজীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের, অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলশ্রুতিতে যে দীন, জীবন ব্যবস্থা জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত হলো তাতে বিশ্বনবীর (দ:) প্রকৃত সুন্নাহর অর্থাৎ আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের, জেহাদের বিবরণ অতি সামান্য, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কম প্রয়োজনীয় অভ্যাসের বিশদ বিবরণ, দীনের গুরুত্বহীন ব্যাপারগুলির অবিশ্বাস্য বিশ্লেষণ। জন সাধারণের মনে দীন সম্বন্ধে আকীদা বোদলে যেয়ে ঐ রকম হোয়ে গেলো। ফলে আজ এ জাতির সামনে মহানবীর প্রসঙ্গ আসলেই তাদের কল্পনায় একটি দৃশ্য ভেসে ওঠে যে, একজন পক্ককেশধারী দীর্ঘ শশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ মানুষ, পরনে আরবীয় আলখেল্লা, মাথায় পাগড়ি, হাতে তসবীহ, নতমস্তকে যেকর কোরতে কোরতে পথ চোলেছেন, ডানে বায়ে দিকপাত কোরছেন না। কারও সাথে সাক্ষাৎ হোলে নানা প্রকার সদুপদেশ দিচ্ছেন। ঠিক অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা বিভিন্ন নাটকে সিনেমায় উপন্যাসে তাদের নবী ও ধর্মপ্রচারকদেরকে যেভাবে চিত্রিত কোরে থাকে (যদিও তাঁরা বাস্তবে বর্তমান অনুসারীদের ধারণার ন্যায় ছিলেন না), এই বিকৃত এসলামের অনুসারীরাও আমাদের নবীকে তেমন মনে করে। কিন্তু এরা কি একবারের জন্যও ভাবতে পারে যে, এরা যাঁর উম্মাহ হিসাবে নিজেদেরকে বিশ্বাস করে (অর্থাৎ আখেরী নবী) তিনি ছিলেন মানবজাতির ইতিহাসের সবচাইতে বড় বিপ্লবী। যাঁর হাতে গড়া মৃত্যুভয়হীন দুর্ধর্ষ সৈন্যরা পৃথিবীর তৎকালীন দুইটি বিশ্বশক্তিকে (Super Power) একসঙ্গে ভেঙ্গে চুরমার কোরে দিয়েছিলেন। যিনি যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হোয়ে নাঙ্গা জুলফিকার হাতে তেজস্বী আরবীয় অশ্বে চড়ে প্রচণ্ড টর্নেডোর গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন সহস্র সুশিক্ষিত কাফের সেনাব্যুহ। কাফেরের ব্যুহ লণ্ডভণ্ড কোরে শত্রুকে আহত ও নিহত কোরে ছিনিয়ে আনতেন বিজয়। যিনি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে কন্যা ফাতেমার হাতে যুদ্ধে ব্যবহৃত রক্তমাখা তলোয়ার তুলে দিয়ে বোলেছেন, “এই তলোয়ার আজ খুব কাজে এসেছে।” যিনি নিজ সৈন্যদের সমাবেশে নিজের তলোয়ার ঊর্ধ্বে। তুলে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা কোরেছেন, “কে আছ এর হক আদায় কোরবে?” (সেরাত ইবনে এসহাক), যিনি বোলেছেন, “আমি আদীষ্ট হোয়েছি মানবজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহকে একমাত্র এলাহ (হুকুমদাতা) হিসাবে মেনে নেয় (ইবনে ওমর থেকে বোখারী, মোসলেম), যিনি বোলেছেন, “আমি যুদ্ধের নবী, আমি দয়ার নবী”, যিনি বোলেছেন, “আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের জন্য তলোয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে আর আমার রেযেক রাখা হয়েছে বল্লমের ছায়ার নিচে (মুসনাদে আহমদ), যাঁকে কাফেরা এক মাসের দূরত্ব থেকে ভয় পেত, যাঁর অমিততেজা সাহাবীরা শত্রুর ছিন্নমস্তক এনে তাঁর

সামনে পেশ কোরতেন, যিনি এমন এক সেনানায়ক যিনি জীবনে কোন যুদ্ধে পরাজিত হন নি সেই বিস্ময়কর অপরাজেয় সেনাপতির প্রতিকৃতি আজ আর এ জাতির মানসপটে ভেসে ওঠে না। না ওঠার কারণ এদের কাছে মহানবী এক অন্য মানুষ। মহানবীর প্রকৃত চরিত্র, উম্মাহর কর্মকাণ্ড একদম ভুলিয়ে দেওয়া হোয়েছে, ফলে তারা লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হোয়ে গেছে।

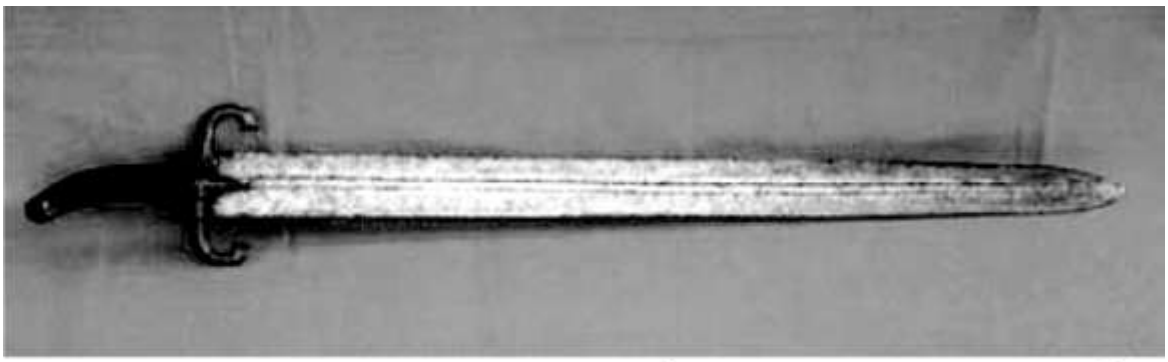

আল্লাহর রসুল বোলেছেন, "আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের জন্য তলোয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে আর আমার রেযেক রাখা হয়েছে বল্লমের ছায়ার নিচে (মুসনাদে আহমদ)। উপরের এই তলোয়ারটি রসুলাল্লাহর রেখে যাওয়া নয়টি তলোয়ারের একটি।

এই যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হোয়ে জাতি কয়েকশ' বছর কাটালো এই সময়টাতে পণ্ডিতদের ফতোয়াবাজী আর সুফীদের অন্তর্মুখী সাধনা খুব জোরে শোরে চোলছিলো। কাজেই পচনক্রিয়াও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিলো সমস্ত জাতির দেহময়। কিন্তু ওর মধ্যেও দলগত ও ব্যক্তিগতভাবে যাদের মনে প্রকৃত দীনের আকীদা ঠিক ছিলো তারা তাদের কাজ কোরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ক্রমে ঐ পচনক্রিয়া জাতিকে এমন অবস্থায় নিয়ে এলো যে এর মধ্যে আর ফতোয়াবাজী ও তসবিহ টপকানো ছাড়া প্রায় আর কিছুই অবশিষ্ট রোইলো না। বিজ্ঞান, চিকিৎসা, রসায়ন, অংক ইত্যাদি সর্বরকম জ্ঞান থেকে এ জাতি বঞ্চিত হোয়ে এক অশিক্ষিত অন্ধ জাতিতে পরিণত হলো। অন্যদিকে জাতির স্রষ্টা বিশ্বনবী (দ:) যে সামরিক প্রেরণায় একে এমন এক দুর্ধর্ষ, অজেয় জাতিতে পরিণত কোরেছিলেন যার সামনে বিশ্ব শক্তিগুলো পর্যন্ত ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত উড়ে গিয়েছিলো, সে প্রেরণাও কর্পুরের মত উড়ে গিয়ে এক অন্তর্মুখী কাপুরুষ জাতিতে পরিণত হলো। যে বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির চর্চা কোরে, গবেষণা কোরে এই জাতি পৃথিবীর জ্ঞানকে সম্মুখে অগ্রসর করিয়ে দিয়েছিলেন সেই জ্ঞান এই জাতির শত্রু ইউরোপের খ্রিস্টান জাতিগুলি লুফে নিয়ে তার চর্চা ও গবেষণা শুরু করলো আর এই উম্মাহ ওসব ছেড়ে দিয়ে বিবি তালাকের মসলা আর ফতোয়া নিয়ে মহাব্যস্ত হোয়ে

পড়লো। এই উম্মাহর আহরিত জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তির উপর খ্রিস্টান ইউরোপ তাদের প্রযুক্তির (Technology) সৌধ গড়ে তুললো এবং তুলে শক্তিমান হোয়ে এই উম্মাহকে সামরিকভাবে আক্রমণ করলো।

এটা ইতিহাস যে, এই আক্রমণ এই জাতি প্রতিহত কোরতে পারে নি এবং অল্প সময়ের মধ্যে বিরাট জাতি ইউরোপের বিভিন্ন জাতির পদানত দাসে পরিণত হোয়ে যায়। ইউরোপের ছোট বড় রাষ্ট্রগুলি এই উম্মাহকে টুকরো টুকরো কোরে কেটে খণ্ডগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ কোরে নেয়। প্রতিরোধ যে হয় নি, তা নয়, হোয়েছে, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে। আর যে জাতির ঐক্য নেই সে জাতি শক্তিহীন, পরাজয় তার স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী। ফকীহ, মুফাস্সের, পণ্ডিতরা পাণ্ডিত্য জাহির কোরতে যেয়ে নানা মাযহাব ফেরকা সৃষ্টি কোরে ঐক্য ধ্বংস কোরে দিয়েছিলেন আর সুফীরা উম্মাহর হাত থেকে তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে তসবিহ ধরিয়ে দিয়েছিলেন, সংগ্রামী চরিত্রই মিটিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই উম্মাহ আর লড়বে কি দিয়ে ইউরোপের বিরুদ্ধে? সুতরাং যা হবার তাই হলো। যে উম্মাহর উপর বিশ্বনবী (দ:) দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন সশস্ত্র সংগ্রাম কোরে সমস্ত পৃথিবীকে এই জীবন ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে এসে মানব জাতির মধ্যে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা কোরতে, সেই জাতি তার সংগ্রামী চরিত্র হারিয়ে নিজেই অন্যের ক্রীতদাসে, গোলামে পরিণত হলো।

জাতি কার্যতঃ মোশরেক ও কাফের

আমি পেছনে বোলে এসেছি মহানবীর (দ:) ৬০/৭০ বছর পর থেকে এই জাতি আর জাতি হিসাবে প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী ছিলো না। কিন্তু মোসলেম ছিলো কারণ তাদের সংবিধান ছিলো কোর'আন এবং হাদীস অর্থাৎ তাদের এলাহ ছিলো আল্লাহ, আর পথপ্রদর্শক ছিলেন - মোহাম্মদ (দ:)। যদিও লক্ষ্যচ্যুত হোয়ে যাবার এবং আকীদা বিকৃত হবার কারণে তাদের এমন নিদারুন পতন এলো যে, তারা ক্রীতদাসে পরিণত হলো কিন্তু এইবার গোলামে পরিণত হবার পর এই জাতি আর মোসলেমও রইলো না, মুশরেকে পরিণত হলো। কারণ বোলছি। আল্লাহ কোর'আনে অনেকবার এই জাতিকে লক্ষ্য কোরে বোলেছেন যে, যদি তোমরা মো'মেন হও তবে আমি তোমাদের পৃথিবীতে উচ্চ রাখব, অন্যান্য জাতিদের উপর তোমাদের প্রবল রাখবো, পৃথিবীর কতৃত্ব, ক্ষমতা তোমাদের হাতে দেব (কোর'আন- সুরা আন নূর ৫৫)। তাহোলে যখন এই জাতি

ইউরোপীয়ানদের কাছে যুদ্ধে হেরে গেলো তখন প্রমাণ হলো যে ঐ জাতি আর মো'মেন নয়। না হলে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি মিথ্যা (নাউযুবিল্লাহ)। তারপর সুরা ফাতাহেত আল্লাহ বোলছেন- "যখন অবিশ্বাসীরা তোমাদের (মোসলেমদের) সঙ্গে যুদ্ধ কোরবে (এখানে আল্লাহ সশস্ত্র যুদ্ধের কথা বোলছেন, কারণ শব্দ ব্যবহার কোরেছেন কেতাল) তখন নিশ্চয়ই তারা পালিয়ে যাবে। (অর্থাৎ হেরে যাবে) অতঃপর তাদের রক্ষা করার কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী থাকবে না। এটা সর্বকালে (পূর্বকাল থেকে সব সময়ই) আল্লাহর সুন্নাহ (রীতি) এবং আল্লাহর এই সুন্নাহ (রীতি) তিনি কখনও বদলান না (কোর'আন- সুরা আল ফাতাহ ২২-২৩)।

লক্ষ্য কোরুন, মোসলেম জাতিকে, উম্মতে মোহাম্মদীকে আল্লাহ কী বোলছেন। তিনি বোলছেন- তোমাদের সঙ্গে যখনই অবিশ্বাসীদের (এখানে অবিশ্বাসী অর্থ যারা শেষ নবীর (দ:) উপর অবতীর্ণ জীবন ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে না) যুদ্ধ হবে তখনই তারা পরাজিত হোয়ে পালিয়ে যাবে। কারণ হিসাবে বোলছেন যে, তাদের রক্ষা করার জন্য কোন অভিভাক বা সাহায্যকারী নেই অর্থাৎ আল্লাহতো উম্মাতে মোহাম্মদীর অভিভাবক এবং সাহায্যকারী আর ঐ পক্ষে কে অভিভাবক বা সাহায্যকারী? আর কেউ নেই। কাজেই পরাজয় ছাড়া তাদের জন্য আর কী সম্ভব? এই বোলে পরের আয়াতে আল্লাহ বোলছেন- এটা অর্থাৎ এই কাজ আমার সর্বকালের সুন্নাহ। সুন্নাহ শব্দের অর্থ হলো কারো কোন রীতি, নীতি, অভ্যাস, নিয়ম ইত্যাদি এবং আল্লাহ বোলছেন এটা আমার সর্বকালের রীতি, অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীর আগেও যে নবীদের (আ:) তিনি পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাদের উম্মাহগুলিও- যখন অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ হোয়েছে তখনও আল্লাহ সব সময়ই তাদের জয়ী কোরেছেন, তাদের শত্রুরা হেরে পালিয়ে গেছে। এরপর বোলছেন আল্লাহর এই সুন্নাহ কখনও বদলাবার নয়।

আল্লাহর এই কথা যে কত সত্য তার প্রমাণ আমরা পাই যখন আমরা উম্মতে মোহাম্মদী অর্থাৎ প্রথম ৬০/৭০ বছরের ইতিহাস পড়ি। সংখ্যায়, আয়োজনে, অস্ত্র-শস্ত্রে, বাহনে, রসদে এক কথায় প্রতি ক্ষেত্রে নগণ্য এই জাতি দুইটি বিশ্বশক্তিকে পরাজিত করলো। আল্লাহ তাঁর সুন্নাহ বজায় রাখলেন। কিন্তু এইবার ইউরোপ থেকে যে আক্রমণ এলো সে আক্রমণে এই জাতি প্রতি যুদ্ধে পরাজিত হলো, যদিও আক্রমণগুলি এসেছিলো ইউরোপের বিভিন্ন ছোট বড় রাষ্ট্রগুলি থেকে। এই

পরাজয় প্রমাণ করলো যে, এই জাতি আর আল্লাহর চোখে মো'মেনও নয় উম্মতে মোহাম্মদীও নয়। কারণ যদি এই জাতি মো'মেন হোয়ে থেকেও যুদ্ধে পরাজিত হোয়ে খ্রিস্টান ইউরোপের দাসে পরিণত হোয়ে যায় তবে আল্লাহর বাণী মিথ্যা (নাউজুবিল্লাহ)। আর নইলে তিনি তার সুন্নাহ বদলিয়ে ফেলেছেন এবং পূর্ববর্তীসব নবীদের উম্মাতের বেলায় না বদলিয়ে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর (দ:) উম্মাহর বেলায় এসে প্রথম তাঁর সুন্নাহ ত্যাগ কোরলেন। এর দু'টোর একটাও সম্ভব নয়, কাজেই একমাত্র সিদ্ধান্ত হলো এই যে, যখন ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি এই জাতিকে, যে জাতি তখনও নিজেকে মো'মেন ও উম্মতে মোহাম্মদী বলে মনে কোরতো (এবং আজও করে) আক্রমণ করলো

এসলামের স্বর্ণযুগে জাতি এবং এই দীনের একটি ভয়ঙ্কর ক্ষতি সাধন করা হয়। দীনের শরিয়াতের চুলচেরা বিশ্লেষণের ফলে জাতির মধ্যে ফেরকা মাযহাব সৃষ্টি হোয়ে জাতিটি খণ্ড-বিখণ্ড হোয়ে যায়। আল্লাহর রসুল বোলেছেন, অনৈক্য সৃষ্টি কুফর, অথচ আজ সুন্নীদের কঠোর বিশ্বাস, চার মাজহাবের কোন একটির অনুসারী হওয়ার ফরদ। অর্থাৎ আল্লাহ-রসুলের ঠিক বিপরীত আকীদা। শিয়াদের মধ্যেও আছে অসংখ্য বিভক্তি।

তখন সেটা আর মো'মেন নয় উম্মতে মোহাম্মদীও নয়। দীনের অতি বিশ্লেষণের ফলে বিভিন্ন মযহাবে ও ফেরকায় বিভক্ত, ছিন্নভিন্ন, ঐক্যহীন এবং সুফী মতবাদের প্রভাবে বিকৃত আকীদায় অন্তর্মুখী, স্থবির জনসংখ্যা। তাদের কাছে তখন জেহাদের চেয়ে যেকেরের গুরুত্ব অনেক ঊর্ধ্বে। আজও আমাদের সমাজে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন সুফী তরিকার অনুসারীরাসহ সাধারণ মুসল্লীরাও আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য অনেক লোক একত্রে গোল হোয়ে বোসে, চোখ বন্ধ কোরে চিৎকার কোরে পাড়া মহল্লা কাঁপিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ধোরে সোবাহান আল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি তাসবীহ পাঠ কোরে থাকেন। অথচ রসুলাল্লাহ তাঁর আসহাবদেরকে নিয়ে মসজিদে নববীতে বোসে এমনিভাবে একবারও আল্লাহর যেকের কোরেছেন বোলে ইতিহাসে কেউ দেখাতে

পারবে না। প্রকৃতপক্ষে যেকের শব্দের অর্থ স্মরণ করা। জীবন চলার ক্ষেত্রে যেখানে আল্লাহর হুকুম আছে, সেটা মানা আর যেখানে আল্লাহর নিষেধ আছে সেটা থেকে বিরত থাকাই হোল আল্লাহর যেকের। তওহীদের মূল কথাই এখানে। মহানবীর আসহাবগণ বাস্তবজীবনে জান-মাল দিয়ে, সংগ্রাম কোরে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব প্রতিষ্ঠা কোরেছেন। "আল্লাহু আকবার" বজ্রধ্বনির মাধ্যমে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কোরতেন যুদ্ধের মাঠে। আর আজ মরা এসলামের মুর্দা মুসলমানেরা গোল হোয়ে "আল্লাহু আকবার" যেকর করে, কিন্তু এদের জাতীয়, সামষ্টিক জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, হুকুমত চলে ইহুদী খ্রিস্টান 'সভ্যতা' দাজ্জালের। এমন যেকের মোনাফেকী, এই যেকের আল্লাহর ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করে। কাজেই আল্লাহ আর এই জনসংখ্যার অভিভাবকও নন, সাহায্যকারীও নন। সুতরাং এর অবশ্যম্ভাবী ফল পরাজয়। সেই যে বিশ্বনবী (দ:) সতর্ক কোরে দিয়েছিলেন দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি কোর না, পরাজিত হবে- ঠিক তাই হলো।

সশস্ত্র সংগ্রামে পরাজিত কোরে খিস্ট্রান রাষ্ট্রগুলি এই বিরাট জাতিটাকে খণ্ড খণ্ড কোরে এক এক রাষ্ট্র এক এক খণ্ড অধিকার কোরে শাসন ও শোষণ কোরতে লাগলো। এ সময় খ্রিস্টানরা তাদের অধিকৃত দেশগুলিতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরে দীনের এই বাড়াবাড়িগুলিকে একেবারে জাতির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ কোরিয়ে দিল। শাসকের মনতুষ্টির জন্য এ জাতির অতি বিশ্লেষণকারী আলেমরা পাশ্চাত্য জাতিগুলির প্রণীত জীবনব্যবস্থার সঙ্গে এসলামের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টায় গণতান্ত্রিক এসলাম, সমাজতান্ত্রিক এসলাম ইত্যাদি বের কোরল। খ্রিস্টানদের পদানত হওয়ার আগে পর্যন্ত এই জাতির সংবিধান ছিলো কোর'আন ও হাদীস। রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ইত্যাদির উৎস ছিলো ঐ কোর'আন ও হাদীস। বিচরালয়ে বিচার হতো আল্লাহর দেয়া আইনে (ফিকাহ), দণ্ড দেয়া হতো আল্লাহর ও রসুলের (দ:) নির্দেশ মোতাবেক। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে তো জাতি বিচ্যুত হোয়ে গিয়েছিলোই তা না হলে তো আর শত্রুর ক্রীতদাসে পরিণত হোতে হোত না। কিন্তু তবুও পরাজিত হবার আগে পর্যন্ত এই জাতির সব কিছুই পরিচালিত হতো কোর'আন সুন্নাহ মোতাবেক (যা এখন আমাদের মধ্যে নেই) অর্থাৎ ঐ জাতি উম্মতে মোহাম্মদী না থাকলেও মোসলেম ছিলো। কিন্তু উদ্দেশ্য অর্জনের সংগ্রাম ত্যাগ করা, লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়া কী অমার্জনীয় অপরাধ তার প্রমাণ এই যে, মোসলেম থাকা সত্বেও সালাত, সওম, হজ্ব , যাকাত ইত্যাদি নিষ্ঠার সাথে করা সত্বেও প্রচুর নফল সালাত, যিকর, মোরাকেবা, তসবিহ, দাঁড়ী, টুপি, পাগড়ী, খানকাহ, হুজরা, লক্ষ লক্ষ সুফী দরবেশ

ও তাদের কোটি কোটি মুরীদ সত্ত্বেও আল্লাহ এই জাতিকে ইউরোপের ছোট ছোট খ্রিস্টান জাতির পদানত কোরে তাদের ক্রীতদাস বানিয়ে দিলেন। অপমানের চূড়ান্ত কোরবার জন্য আল্লাহ এতখানি কোরলেন যে, পর্তুগালের মত মাত্র কয়েক লক্ষ লোকের একটি ছোট্ট রাষ্ট্রের গোলাম বানিয়ে দিলেন এই উম্মাহর কয়েক কোটি মানুষকে। যখন এই উম্মাহ সশস্ত্র সংগ্রামে শত্রুর কাছে পরাজিত হলো তখন কোর'আন মোতাবেক প্রমাণ দেখিয়ে এসেছি যে, তারা আর আল্লাহর চোখে মো'মেন নেই। এবার হাদীস দিয়ে দেখাচ্ছি। একদিন মহনবী (দ:) সালাতের পর স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশিক্ষণ দোয়ায় ব্যাপৃত রোইলেন। সাহাবারা (রা:) অপেক্ষা কোরছিলেন। দোয়া শেষে তারা জিজ্ঞাসা কোরলেন আজ এত দেরী হলো কেন? আল্লাহর রসুল (দ:) বোললেন- আজ আমি আল্লাহর কাছে তিনটি জিনিসের জন্য প্রার্থনা কোরছিলাম। একটা হলো (পূর্ববর্তী অনেক উম্মাহর মত তাদের পথ ভ্রষ্টতার জন্য) আমার উম্মাহকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস কোরে দিওনা, দ্বিতীয়টা আমার উম্মাহ যেন শত্রুর কাছে কখনো পরাজিত না হয় এবং তৃতীয়টি হলো আমার উম্মাহ যেন নিজেদের মধ্যে মারামারি না করে। আল্লাহ প্রথম দু'টি মঞ্জুর কোরেছেন, তৃতীয়টি করেন নি (হাদীস খাব্বাব বিন আমর (রা:) থেকে তিরমিযি, নাসায়ি, মেশকাত)। দ্বিতীয়টি লক্ষ কোরুন। 'আমার উম্মাহ যেন শত্রুর কাছে পরাজিত না হয়' এবং ওটা আল্লাহ মঞ্জুর কোরলেন। এরপর যদি ঐ উম্মাহ আটলান্টিকের তীর থেকে বোর্নিও পর্যন্ত সর্বত্র যুদ্ধে পরাজিত হোয়ে ঘৃণিত ক্রীতদাসে পরিণত হয় তবে হয় স্বীকার কোরতে হবে যে, আল্লাহ নবীকে (দ:) দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কোরলেন আর তা না হলে ঐ জাতি আর মোহাম্মাদের (দ:) প্রকৃত উম্মাহও নয় মো'মেন নয়। আর কোনও সিদ্ধান্ত নেই। আল্লাহর ঐ প্রতিশ্রুতি শুধু ঐ একটা হাদীসে নয়, আরও হাদীসে আছে। উদাহরণ স্বরূপ আমর বিন কায়েস থেকে দারিমী মেশকাত ইত্যাদি। এছাড়াও মো'মেন হোলে যে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে জয় স্বয়ং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তা কোর'আনের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। যেমন সুরা ইমরানের ১৩৯ আয়াত, সুরা নূরের ৫৫ আয়াত ইত্যাদি। শুধু প্রতিশ্রুতি নয় সুরা রুমের ৪৭ আয়াতে আল্লাহ বোলছেন- মো'মেনদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য, আল্লাহ যদি নিখুঁত হোয়ে থাকেন তবে তিনি ঐ জাতিটি; যেটি ইউরোপের সামরিক আক্রমণে পর্যুদস্ত হোয়ে গেলো, ঐ জাতিটাকে মো'মেন বোলে স্বীকৃতি দেন নি, আর তা না হলে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হোয়েছেন। আল্লাহ সোবহান যেমন সত্য তেমনি সত্য যে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হোতে পারেন না। কাজেই

অনিবার্য সিদ্ধান্ত হলো যে, ঐ জাতি মো'মেন ছিল না। অথচ ভুললে চোলবে না যে, এই সময় এই জাতির সংবিধান কোর'আন হাদীস, বড় বড় ফকীহ, মুফাস্সের, মোহাদ্দেস, পীর, দরবেশ, সুফী ইত্যাদি কিছুরই অভাব ছিলো না, শুধু অভাব ছিলো না বোললে হয় না বরং বোলতে হয় এসব দিয়ে জাতি ভরপুর ছিলো। কিন্তু আল্লাহ এসব কিছুই দেখলেন না, তোয়াক্কা কোরলেন না। তিনি এই উম্মাহকে ইউরোপের খ্রিস্টান জাতিগুলির গোলামে পরিণত কোরে দিলেন এবং দিলেন এই

অনেকে মিলে চিৎকার কোরে পাড়া মহল্লা কাঁপিয়ে সোবাহান আল্লাহ, আল হামদুলেল্লাহ ইত্যাদি তাসবীহ পাঠ করা বিকৃত এসলামে একটি এবাদত হিসেবে পরিগণিত। অথচ রসুলাল্লাহর সমগ্র জীবনে মসজিদে তাঁর আসহাবদের নিয়ে গোল হোয়ে বসে এভাবে যেকর করার একটি ঘটনাও নেই।

বিরাট জাতিটার সবটকু- শিয়া, সুন্নী, হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী ও অন্যান্য কোন ফেরকাও বাদ রোইলো না। বাদ রোইলো শুধু মধ্য আরবের ঐ জায়গাটুকু যেখানে কাবা আর বিশ্বনবীর (দ:) রওজা মোবারক অবস্থিত। ওটুকুও যদি খ্রিস্টান শক্তিগুলি দখল কোরতে চাইতো

তবে তাও রক্ষা করার শক্তি এ জাতির ছিলো না। কিন্তু বোধহয় আল্লাহর তাঁর নিজের ও তাঁর প্রিয় হাবিবের সম্মান ও ইয্যতের খাতিরে নিজে এ স্থানটুকু রক্ষা কোরলেন।

দুর্দান্ত গতিশীল উম্মতে মোহাম্মদী যুদ্ধ ছেড়ে অজিফা পাঠ কোরে রীপুজয়ী পীর-বুজুর্গ হওয়ার সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। পরিণতিতে তারা অন্য জাতির গোলামে পরিণত হয়। অথচ আজও এ জাতির ধ্যান ভাঙছে না। তাদের বিরাট একটি অংশ সেই পথভ্রষ্ট, ভারসাম্যহীন তাসাওয়াফের অনুসারী সুফী দরবেশদের কবরকে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত কোরেছে এবং সেখানে গিয়ে ওরশ ইত্যাদি পালন করাকেই এসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বোলে বিশ্বাস কোরছে। অথচ মহানবীর হাতে গড়া উম্মতে মোহাম্মদীর সদস্যরা এগুলি কল্পনাই কোরতে পারতো না।

এই জাতি এই উম্মাহর জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দ:) যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ কোরে দিয়েছিলেন সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার শাস্তি কী ভয়াবহ হলো। এই যুদ্ধে ইউরোপীয়ানই খ্রিস্টান লক্ষ লক্ষ পুরুষ-নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা শিশুকে গুলি কোরে, ট্যাংকের তলায় পিষে, আগুনে পুড়িয়ে এমনকি জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা কোরেছে, লাইন কোরে দাঁড় করিয়ে মেশিনগান কোরেছে, আল্লাহ কি এসব দেখেন নি? নিশ্চয়ই দেখেছেন, কিন্তু একটি আংগুল তুলেও সাহায্য করেন নি। কারণ তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শুধু মো'মেনকে, উম্মাতে মোহাম্মদীকে সাহায্য করার। এই জাতিটি যে

তখনও মোসলেম তিনি তাও পরোওয়া কোরলেন না। এই উম্মাহকে পরাজিত কোরে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার পর ইউরোপীয়ান জাতিগুলি তাদের যার যার দখল করা এলাকায় তাদের নিজেদের তৈরি আইন ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করলো।

আল্লাহর শেষ নবী (দঃ) এসলামের যে শেষ সংস্করণটি নিয়ে এসেছেন তা যে অত্যন্ত সহজ, সরল এবং ভারসাম্যযুক্ত। এই সহজ সরলতা, এই ভারসাম্য এসলামের প্রাণ, মর্মবাণী। এই হোচ্ছে মহানবী (দঃ) বর্ণিত পুলসেরাত। তলোয়ারের ধারের মত সুক্ষ্ম একটি সেতু, যে সেতু পার না হোয়ে জান্নাতে পৌছনো যাবে না। এই ভারসাম্য হোচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতের ভারসাম্য, দেহ ও আত্মার, শরীয়াত এবং মারেফতের ভারসাম্য। এজন্যই আল্লাহ এই উম্মাহকে বোলেছেন, "আমি তোমাদেরকে ভারসাম্যযুক্ত জাতি হিসেবে সৃষ্টি কোরেছি (মিল্লাতান ওয়াসাতা-সুরা বাকারা ১৪৩)। যে বা যারা যে কোন দিকে কাত হোয়ে এই ভারসাম্য নষ্ট কোরবেন তিনি মহা পণ্ডিত, মহা আলেম হোতে পারেন, মহা সাধক, মহা সুফী হোতে পারেন, ফুঁ দিয়ে আগুন ধরাতে পারেন, নদী হেঁটে পার হোতে পারেন কিন্তু তিনি মোহাম্মদের (দঃ) মাধ্যমে প্রেরিত শেষ এসলামে নেই। ইহুদীদের রাব্বাই, সাদ্দুসাইরা শেষ এসলামের আলেমদের চেয়ে পাণ্ডিত্যে কম ছিলেন না, কিন্তু আল্লাহর চোখে তারা তার নবী ঈসার (আঃ) বিরোধী ও শত্রু। আর অন্যান্য ধর্মের মহা সাধকরাও আমাদের মহা সুফীদের চেয়ে অধ্যাত্ম শক্তিতে কোন কম যান নি। কোন জাতি শরীয়াহ নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরলে দীনের আধ্যাত্মিকতা হারিয়ে গেছে, আবার কেউ শরীয়াহকে পূর্ণ ত্যাগ কোরে সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিকতায় মগ্ন হোয়ে গেছে। এভাবে দীনের ভারসাম্য নষ্ট হোয়ে গেছে। এই ভারসাম্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ আবার নবী পাঠিয়েছেন। আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতের, শরীয়াহ ও আধ্যাত্মিকতার একটা ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা দিয়ে শেষ রসুলকে পাঠিয়েছেন। তিনি পরিশ্রম ও কঠোর অধ্যবসায় কোরে, স্বশস্ত্র সংগ্রাম কোরে এমন একটা জাতি তৈরী কোরেছেন, যে জাতি ৬০-৭০ বছরের মধ্যে অর্ধপৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা কোরল কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে। তাঁর উম্মাহর উপরে দায়িত্ব ছিল সমস্ত দুনিয়াতে দীন প্রতিষ্ঠার, কিন্তু এই উম্মাহ সে দায়িত্ব ভুলে জেহাদ ত্যাগ কোরল। তাদের একদল সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কোরে সহজ-সরল দীনটাকে জটিল, দুর্বোধ্য, মাকড়সার জালের ন্যায় সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরে নিয়ে গেল। তাদের এইসব তাফসির, ফেকাহর, সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিশ্লেষণের উপর গড়ে উঠল বিভিন্ন মত, পথ, ফেরকা, মাজহাব যা জাতিকে খণ্ড-বিখণ্ড কোরে দিল। আরেকদল আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম ত্যাগ কোরে অন্তর্মুখী হোয়ে গেল, সেখানে আধ্যাত্মিক সাধনা কোরে রিপুজয়ী, সাধু-সন্ন্যাসী হওয়ার চেষ্টা কোরল এবং দীনের বহির্মুখী, সংগ্রামী, জেহাদী চরিত্রকে অন্তর্মুখী, ঘরমুখী কোরে ফেলল। দুই দলই দীনের ভারসাম্য নষ্ট কোরে ফেললো। আজ আমরা সারা পৃথিবীতে এসলামের যতগুলি রূপ দেখছি সেগুলির সবই কোন না কোনভাবে ভারসাম্যহীন অর্থাৎ সেগুলি জীবনব্যবস্থা হিসাবে উপযোগী নয়, তাই সেগুলি মানুষকে শান্তি দিতে ব্যর্থ হোচ্ছে। আল্লাহর দেওয়া ভারসাম্যপূর্ণ সত্যদীনের সঠিক রূপ মহান আল্লাহ দয়া কোরে আবার যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে দান কোরেছেন। এ সত্যদীন মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত হোলে জাগতিক উন্নতির পাশাপাশি মানুষ ফিরে পাবে তার হারিয়ে যাওয়া মনুষ্যত্ব। সে অনুভব কোরবে টাকা-পয়সা, ভোগ বিলাসই মানবজীবনের পরম স্বার্থকতা নয়, এগুলো মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, বরং মহান আল্লাহ তা'আলাই হোচ্ছেন সকল শান্তির উৎস।

প্রকাশনায়
তওহীদ প্রকাশন
৩১-৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল# ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৮৭০১৭৪৬৪৩, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫
ওয়েবসাইট: www.hezbuttawheed.com